ইসলামী মতাদর্শের আলোকে

সামাজিক আন্দোলন

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

ইসলামী মতাদর্শের আলোকে সামাজিক আন্দোলন

ইসলামী মতাদর্শের আলোকে
সামাজিক আন্দোলন

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

LET PEOPLE THINK

ইসলামী মতাদর্শের আলোকে সামাজিক আন্দোলন

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০১৪
সর্বশেষ প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০২২

প্রকাশক: সিএসসিএস পাবলিকেশন্স
কার্যালয় (অস্থায়ী): এসই— ১৫,
দক্ষিণ ক্যাম্পাস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
চট্টগ্রাম-৪৩৩১।
০১৯৫৩ ৩২৩০৩০
connect.cscs@gmail.com
cscsbd.com

নির্ধারিত মূল্য: ১০০ টাকা মাত্র

'Islami Motadorsher Aloke Samajik Andolon' (Social Movement from Islamic Perspective) by Mohammad Mozammel Hoque, published in September 2022 by CSCS Publications, South Campus, University of Chittagong. BDT 100 only.

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ

أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত,
মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে।
তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে
এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।

আল কোরআন, সূরা আল আলে ইমরান, আয়াত নং ১১০

সূচি

ভূমিকা ৯

১. ইসলাম ১১

২. ইসলামী আন্দোলন ১৭

৩. ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একজন কর্মীর কর্মধারা ২৫

৪. দ্বীন ও শরীয়াহর পারস্পরিক সম্পর্ক ও পার্থক্য ৩৫

৫. সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্তঃসম্পর্ক ৩৯

৬. 'ইসলামী রাষ্ট্র' অথবা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ৪৩

৭. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইসলামসম্মত প্রক্রিয়া ৫১

৮. একবিংশ শতাব্দীতে কাজের উপযোগী সংগঠনব্যবস্থা ৫৫

৯. সেক্টরভিত্তিক কাজের সাথে ইসলামের সামগ্রিকতার সমন্বয় ৬১

১০. সামাজিক আন্দোলনের কাজ কি নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ? ৬৫

শেষ কথা ৬৯

ভূমিকা

“প্রথমে ওরা এলো কমিউনিস্টদের ধরতে
আমি প্রতিবাদ করিনি
কেননা আমি কমিউনিস্ট ছিলাম না।
তারপর তারা সোশ্যালিস্টদের ধরতে এসেছিল
আমি প্রতিবাদ করিনি
কারণ আমি সোশ্যালিস্ট ছিলাম না।
তারপর তারা এলো ইহুদিদের ধরতে
আমি প্রতিবাদ করিনি
কারণ আমি ইহুদি ছিলাম না।
তারপর ওরা আমাকে ধরতে এলো
তখন আমার হয়ে প্রতিবাদ করার কেউ অবশিষ্ট ছিল না।”

নায়মোলার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান নৌবাহিনীর সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি হিটলারের সমালোচক হয়ে ওঠেন। জাতীয় বীর হওয়ার কারণে মত্যুদণ্ড না দিয়ে তাকে কারাগারে অন্তরীণ করে রাখা হয়। নায়মোলারের অনুশোচনার উপর্যুক্ত কথাগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি সামাজিক অসঙ্গতি এক পর্যায়ে ও কোনো না কোনোভাবে সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই দৃষ্টিতে সামাজিক আন্দোলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সামাজিক আন্দোলন সাধারণত ইস্যুভিত্তিক হয় বা কোনো একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্যে হয়। আবার কোনো আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যেও সামাজিক আন্দোলন হতে পারে।

ইসলামী আন্দোলন মূলত একটি সামাজিক আন্দোলন। এর একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ তাত্ত্বিক দিক রয়েছে। এর ক্রমবিকাশের ধারায় রাজনৈতিকতা

(polity) যার অনস্বীকার্য পরিণতি। ইসলামসহ সামাজিক আদর্শ মাত্রেরই তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক বিবেচনা জরুরি। এরই আলোকে 'ইসলামী মতাদর্শের আলোকে সামাজিক আন্দোলনের' তত্ত্ব ও প্রয়োগযোগ্যতার প্রধান দিকগুলোর একটি সুসংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেয়ার চেষ্টা করেছি।

১. ইসলাম

চিরন্তন জিজ্ঞাসা

প্রত্যেক মানুষের মনেই জীবন, জগৎ ও বাস্তবতা সম্পর্কিত কিছু মৌলিক প্রশ্ন থাকে। মানুষ সব সময় এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে ফেরে। এগুলো শুধু দার্শনিক সমস্যাই নয়, মানুষের জীবনের বাস্তব সমস্যার বিষয়ও বটে। নানা আদর্শ ও মতবাদ এগুলোর বিভিন্ন রকমের তত্ত্বগত সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছে, এখনো করছে। কেউ বলেছে, এ জগতের বাইরে কোনো জগৎ ছিল না এবং থাকবে না। আবার কেউ বলেছে, এ ধরনের জগৎ থাকবে, এমনকি মৃত্যুর পর এ জগতে মানুষের পুর্নজন্ম হবে। আর বাস্তবতা সম্পর্কে এসব মতাদর্শের বক্তব্য হলো, যে শক্তিমান সে-ই প্রতিনিধিত্ব কিম্বা প্রভুত্ব করবে, আর যে দুর্বল সে অধীনস্ত থাকবে। অবশ্য কোনো মতাদর্শ বলছে, সবাই সমান হবে। সেক্ষেত্রে সমান বলতে কী বুঝানো হবে, তা নিয়েও বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে।

কোনো কোনো আদর্শ মোটাদাগে এ বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। তাদের মতে, এগুলো কোনো মৌলিক ব্যাপারই নয়। এ ধরনের মতাদর্শ অন্তর্গতভাবে নৈরাজ্যবাদী (anarchist) হলেও বাহ্যিকভাবে বিভিন্ন পরিশীলিত নামে পরিচিত। যেমন, অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism), সংশয়বাদ (skepticism) ও নির্বিকারবাদ (irrelevantism) ইত্যাদি।

ইসলাম হলো অন্যতম উত্তর

যা হোক, জীবন, জগৎ ও বাস্তবতা সম্পর্কিত এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর অন্যতম উত্তর হলো ইসলাম। তিরমিযী শরীফের একটা হাদীসে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اَلَا

اَدُلُّكُمْ بِرَأسِ الْاَمْرِ وَعُمُودِهِ وَذَرْوَةِ سَنَامِه قُلْتُ بَلى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ رَأسُ الْاَمْرِ الْاِسْلَامُ وَعُمُوْدُه اَلصَّلوةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِه اَلْجِهَادُ

"মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে বলবো সবকিছুর মূল রহস্য, এর ভিত্তি, এবং এর সর্বোচ্চ চূড়া কী? আমি বললাম, আপনি বলুন হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন, সবকিছুর মূল হচ্ছে ইসলাম, এর ভিত্তি হচ্ছে নামাজ এবং এর সর্বোচ্চ হচ্ছে জিহাদ।" [আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ]

কিছু মতাদর্শকে ইসলাম আদতেই প্রত্যাখান করে, কিছু মতাদর্শকে ইসলাম নিজস্ব ছাঁচে গ্রহণ করে, আবার কিছু 'মতাদর্শ'কে ইসলাম মূলত ব্যবহারিক পদ্ধতি (working tool) হিসেবে গ্রহণ করে। ইসলাম এই অর্থে অনন্য নয় যে অপরাপর কোনো 'মতাদর্শে'র সাথে এর আদৌ কোনো সাযুজ্যতা নাই। বরং অপরাপর সব মতাদর্শের যৌক্তিক, ভালো ও কল্যাণমূলক সব বিষয়কে গ্রহণ করার সাথে সাথে সেসবের সংশ্লিষ্ট অসামঞ্জস্যতাসমূহকে দূর করে একটি পূর্ণ (total) প্রস্তাবনা উপস্থাপনার কারণে ইসলাম একটি অনন্য জীবনাদর্শ।

মতাদর্শ হিসেবে প্লাটোর কল্পরাষ্ট্র (utopia) হতে ইসলামের পার্থক্য হলো, ইসলাম উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য বাস্তবায়িত অবস্থায় ছিলো। এর ব্যাপকতর অংশ বিচ্ছিন্নভাবে এখনো বাস্তবে বিদ্যমান, যার পূর্ণ বাস্তবায়ন একবিংশ শতাব্দীতেও সম্ভবপর। সমস্যা হলো, পক্ষ-বিপক্ষ উভয় তরফ হতে ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত চিন্তা-পদ্ধতিগত (paradigmatic) বিভ্রান্তি।

কোন ইসলাম?

ইসলামের আবির্ভাবের সময় থেকে এ পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় দেড় হাজার বছরের ইতিহাস অনুযায়ী, ইসলাম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে আচরিত (practised) হয়েছে। ফলে ইসলামের বিভিন্ন ধরন, মতামত, ব্যাখ্যা ইত্যাদিও গড়ে উঠেছে। তাহলে ইসলামের ভিত্তিতে সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইসলামকে কীভাবে দেখা হবে– তা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর হলো, কোরআন ও হাদীসের মতবিরোধহীন সুস্পষ্ট বর্ণাগুলোতে ইসলামের যে ধরন বা রূপ আছে, তাকেই বিবেচনায় নিতে হবে।

সূরা আলে ইমরানের ৭ নং আয়াত অনুসারে কোরআনের আয়াতসমূহ দুই শ্রেণীর। যথা:

১। আয়াতে মুহকাম বা দ্ব্যর্থহীন আয়াত এবং
২। আয়াতে মুতাশাবিহ বা দ্ব্যর্থবোধক আয়াত

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, মুহকাম আয়াতসমূহই 'উম্মুল কোরআন' তথা কোরআনের ভিত্তি। অর্থাৎ মানুষের অনুসরণের (হেদায়াত) জন্য পবিত্র কোরআনের দ্ব্যর্থহীন আয়াতসমূহ যথেষ্ট। বাদবাকি দ্ব্যর্থবোধক (রূপক) আয়াতগুলোর ওপর শুধুমাত্র বিশ্বাস পোষণ করতে হয়। দুনিয়ার এই জীবনের সাথে প্রায়োগিক দিক থেকে সংশ্লিষ্ট না হওয়ায় সেগুলোর গূঢ় তাৎপর্য অনুসন্ধান প্রচেষ্টাকে 'ফিতনা' বা বিপর্যয়ের কারণ বলা হয়েছে। সারকথা হলো, ইসলামের যে বিষয়গুলো কোরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ইসলামকে সেগুলো দিয়েই সংজ্ঞায়িত করার বিকল্প নাই।

ইসলামের ভাষ্য-পদ্ধতি

কেবল ইসলামই নয়, বরং যে কোনো আদর্শের অনুসারীরাই স্থান-কাল-পাত্রভেদে নিজেদের মতো করে সংশ্লিষ্ট আদর্শকে অনুসরণ করে। তাই ইসলামকে বুঝার জন্য বা 'ইসলামী' কোনো কিছুকে বুঝার জন্য 'লোকজ ইসলামের' গুরুত্ব ও বিবেচনা নিতান্তই প্রাসঙ্গিক (relevant) বিষয়। কোরআন-হাদীসের মতো প্রামাণ্য ও মৌলিক পাঠ্যগ্রন্থ থাকায় কেবলমাত্র অনুসারীদের আচারনির্ভর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ইসলামের মতো মতাদর্শ সম্পর্কে ধারণা করা যথোচিত নয়। তাই ইসলাম সম্পর্কে ভাষ্যদানের ইতিহাসনির্ভর পদ্ধতির (historical approach) চেয়ে বিষয়নির্ভর পদ্ধতি (thematic approach) অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং গবেষণা-নৈতিকতার দাবি।

ধর্ম ও রাজনীতি

ধর্ম ও রাজনীতি হলো দুটি নিতান্তই প্রাসঙ্গিক ও অতিসংবেদনশীল বিষয়। ঐতিহাসিকভাবে ইসলাম 'ধর্ম' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ইসলামের 'ধর্ম-

পরিচিতির’ প্রেক্ষিত কিম্বা যৌক্তিকতা এই আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। বরং উপর্যুক্ত বিষয়নির্ভর ব্যাখ্যা পদ্ধতির নিরিখে অতি সংক্ষেপে ধর্ম ও রাজনীতির দিক থেকে ইসলামকে বুঝার জন্য চেষ্টা করা হবে।

ধর্ম:

ধর্ম বলতে কী বুঝায়, তা নিয়ে একাডেমিক আলোচনা-পর্যালোচনা হতে পারে। ধর্মের সংজ্ঞা নির্ধারণ কিম্বা প্রচলিত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণের চেয়ে ধর্মের একটি বিশেষ পরিচিতিমূলক বৈশিষ্ট্য নিয়ে যদি আমরা ভাবি, তাহলে সবাই অন্তত এই একটি বিষয়ে একমত হবেন যে ‘আধ্যাত্মিকতা’ই হলো ধর্মের মূল পরিচয়।

বিশেষত নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ ধর্মমতের কারণে ঈশ্বরতত্ত্বকে ধর্মের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায় না। অথচ, বস্তুজগতের পরিপূরক কিম্বা অতিবর্তী হিসেবে দেহাতিরিক্ত একটি সত্তা এবং এর ‘মুক্তি’কে সব ধর্মেই বিবেচনা (address) করা হয়েছে।

ইসলামে এই বস্তু-অতিবর্তী চিন্তা তথা আধ্যাত্মিকতার প্রসঙ্গ অপরিহার্যভাবে এসেছে। এর সাথে রয়েছে খোদার অস্তিত্ব, পরকাল, প্রার্থনা-পদ্ধতিসহ ধর্মের অপরাপর বৈশিষ্ট্যসমূহ। এই দৃষ্টিতে ইসলাম একটি ধর্ম বটে।

কিন্তু ইসলামের দিক থেকে অভিনব ব্যাপার হচ্ছে, এখানে ধর্মের কিছু সাধারণ (common) বিষয়কে অস্বীকার করা হয়েছে! পরম সত্তা তথা ঈশ্বরের সাথে সসীম মানবের মধ্যস্থতাকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে সব ধর্মে যাজকতন্ত্রের স্বীকৃতি রয়েছে। অথচ ইসলাম তা অস্বীকার করেছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ- أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

“আর, আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে; তখন তাদের বলে দাও, নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহ্বান করে।” [সূরা বাকারা: ১৮৬]

এর পাশাপাশি পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"তোমাদের মুখ পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে ফিরাবার মধ্যে কোনো সওয়াব নেই। বরং সওয়াবের কাজ হচ্ছে মানুষ আল্লাহ, কিয়ামত দিবস, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদেরকে মনে-প্রাণে মেনে নেবে এবং আল্লাহপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রাণপ্রিয় ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য ব্যয় করবে। আর নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দান করবে। যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করবে এবং বিপদে-অনটনে ও হক-বাতিলের সংগ্রামে ধৈর্যধারণ করবে, তারাই সৎ ও সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই মুত্তাকী।" [সূরা বাকারা: ১৭৭]

এই আয়াতে সওয়াব তথা কল্যাণজনক কাজের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তার সবগুলোই ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট। কোরআন ও হাদীসে এমন বেশ কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, যা দৃশ্যত ধর্মবিরোধী।

রাজনীতি:

'ধর্মের' বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ইসলামে ধর্মের পক্ষে ও বিপক্ষে উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামে ধর্মবিরোধী অবস্থানের অন্যতম নিদর্শন হলো এতে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের উপস্থিতি। বিবেচনার বিষয় হলো, ইসলামে রাজনীতির প্রসঙ্গ কি শুধুই প্রাসঙ্গিক নাকি মৌলিক? নিরপেক্ষ বিবেচনায় মানুষের কল্যাণের বিষয়টিকে ইসলামে সামগ্রিকভাবে দেখা হয়েছে। যার ফলে, সংশ্লিষ্ট সব তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিককে এখানে সমন্বয় করে একটি পূর্ণ, সামগ্রিক ও সুসামঞ্জস্য জীবনপদ্ধতি হিসেবে একে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ধরা যাক, কোনো তত্ত্ব বা আদর্শ বা 'কোনো কিছু' কী হলে ধর্ম হবে তা স্বাধীনভাবে ও গবেষণার দৃষ্টিকোণ হতে (from academic point of view)

নির্ধারণ করা হলো। কী কী বৈশিষ্ট্য থাকলে ‘কোনো কিছু’ একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে গণ্য হবে, তাও নির্ধারণ করা হলো।

এই নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোকে ইসলামকে যাচাই করলে দেখা যাবে ইসলামে ধর্ম কিম্বা রাজনীতির কোনোটিই কম গুরুত্ববহ নয়। ধর্ম, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজসহ সব মানবিক বিষয়কেই ইসলামে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

যদি তা-ই হয়, সেক্ষেত্রে ‘ইসলাম একটি অরাজনৈতিক ধর্ম’, কিংবা ‘ইসলাম হলো রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট একটি ধর্ম’, কিংবা ‘রাজনীতি হলো ইসলাম ধর্মের লক্ষ্য’— এই সবগুলো ধারণাই প্রান্তিক এবং ভুল। এর পাশাপাশি বিষয়নিষ্ঠভাবে না দেখে, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ইসলামকে রাজনীতিতে ব্যবহারের একটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাম্প্রতিক প্রবণতাও লক্ষ্যণীয়।

সারকথা হলো, ইসলাম একটি অনন্য মতাদর্শ যা নিজ নিজ অবস্থানে রেখে ধর্ম ও রাজনীতিসহ মানবজীবনের সবগুলো দিককে বাস্তবসম্মতভাবে সমন্বিত করেছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

“আমি এই কোরআনে মানুষদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছি।” [সূরা বনী ইসরাইল: ৮৯]

২. ইসলামী আন্দোলন

ইসলামকে বাস্তবে মেনে চলার প্রচেষ্টা হলো ইসলামী আন্দোলন। আমরা জানি, সামাজিক প্রয়োগযোগ্যতার দিক থেকে ইসলামের চারটি পর্যায়। অন্য কথায় ইসলামী আন্দোলনের চারটি ধাপ। সংশ্লিষ্ট সামাজিক বাস্তবতা এবং উদ্যোক্তাদের সামর্থ বিবেচনায় ইসলামী আন্দোলনের এর ধাপসমূহের কোনো একটা মানুষ অংশগ্রহণ করবে।

সক্রিয়তা ও ঐকান্তিকতা থাকা সাপেক্ষে এই পর্যায়সমূহের পূর্ববর্তী ধাপ স্বভাবতই পরবর্তী ধাপে উন্নীত হবে।

ইসলামী আন্দোলনের এই চারটি ধাপ বা লেভেল অনুসরণ করে এই অধ্যায়ের আলোচনাকে চার ভাগ করা হয়েছে:

(১) ইসলামী আন্দোলনের ফার্স্ট লেভেল: ভিত্তি স্তর
(২) ইসলামী আন্দোলনের সেকেন্ড লেভেল: প্রাথমিক স্তর
(৩) ইসলামী আন্দোলনের থার্ড লেভেল: মধ্য স্তর
(৪) ইসলামী আন্দোলনের ফোর্থ লেভেল: উচ্চ স্তর।

(১) ইসলামী আন্দোলনের ফার্স্ট লেভেল: ভিত্তি স্তর

বুদ্ধিবৃত্তি তথা জগত, জীবন ও বাস্তবতা সম্পর্কে প্রশ্নাবলি, বিশেষ করে বললে, ‘প্রশ্ন’ মাত্রই মানুষের প্রজাতিগত অনন্য বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। এটি ইসলামেরও অন্যতম মৌলিক অনুষঙ্গ। এটি মানুষকে আরেকটা সমগুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গের দিকে পরিচালিত করে, যাকে আধ্যাত্মিকতা (spirituality) বলা যেতে পারে। মানুষের বস্তুগত সত্তা বা অস্তিত্বের অতিরিক্ত যে সত্তা রয়েছে, ওই সত্তাই তাকে নিয়ে যায় একটা অতিবর্তীতার (transcendence) দিকে।

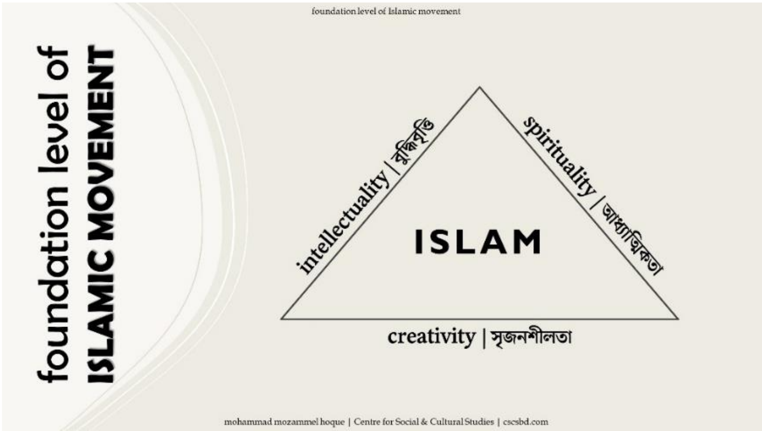

এমনকি কোনো নিরীশ্বরবাদী 'বস্তুবাদী'ও যখন কোনো না কোনো ধরনের মানবতা কিংবা নৈতিকতার কথা বলেন, তখন তিনি অঘোষিতভাবে বস্তু-অতিরিক্ত এক বিশেষ মানবিকসত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেন। এই বস্তু-অতিবর্তীতাই হলো আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য। আধ্যাত্মিকতা মানুষকে ঈমানের দিকে নিয়ে যায়। ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ হলো আধ্যাত্মচেতনা তথা আধ্যাত্মিকতা।

আধ্যাত্মিক চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তি মানুষকে জগতের সাথে কর্মসূত্রে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে সৃষ্টিশীলতার দিকে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাকে পূর্ণত্বের দিকে পরিচালিত করে। এ জন্যে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের ভিত্তি স্তরে বুদ্ধিবৃত্তি ও আধ্যাত্মিকতা হলো অপরিহার্য দুটি অনুষঙ্গ।

বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিকতা যখন সমন্বিত হয় তখন অনিবার্যভাবে তৃতীয় একটি বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে, যাকে সৃজনশীলতা বা মননশীলতা (creativity) হিসেবে বলা যায়।

একটি সমবাহু ত্রিভুজের তিনটি বাহুর মতো ইসলামী আন্দোলনের এই পর্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তি, আধ্যাত্মিকতা ও মননশীলতা হচ্ছে তিনটি সমভাবে অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

(২) ইসলামী আন্দোলনের সেকেন্ড লেভেল: প্রাথমিক স্তর

ইসলামী আন্দোলনের ভিত্তিস্তরের অব্যবহিত উপরিস্তরকে প্রাথমিক স্তর বা পর্যায় বলা যেতে পারে। ব্যক্তিগত মৌলিক মানবীয় বৃত্তি হিসেবে বুদ্ধিবৃত্তি,

আধ্যাত্মিকতা এবং মননশীলতার সমন্বয়ের ফলে চতুর্থ আরেকটি বিষয়ের উৎপত্তি ঘটে, সেটা হচ্ছে সামাজিক দায়বোধ।

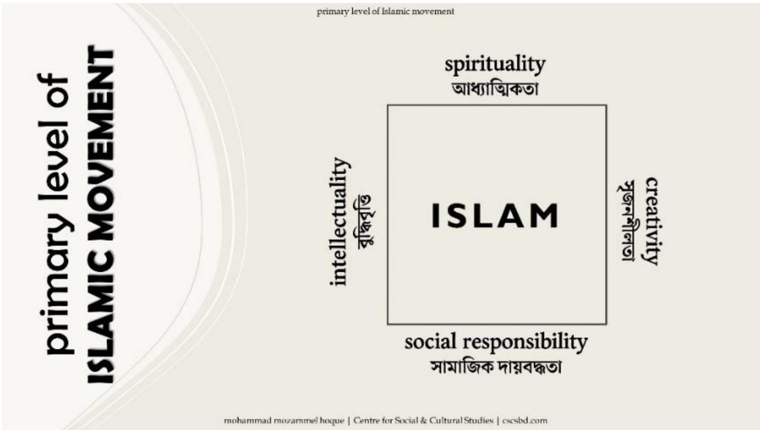

সামাজিক আন্দোলনের এই পর্যায়ের কর্মকাণ্ড একটি বর্গক্ষেত্রের মতো চারদিকে সমভাবে বিস্তৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কর্মক্ষেত্রের এই সমগুরুত্ব পরিমাণগত (quantitative) নয়, বরং গুণগত (qualitative)।

পারিবারিক দায়-দায়িত্ব বহন করা হলো সামাজিক দায়বোধের প্রথম পর্যায়। সুষম পারিবারিক ব্যবস্থা হলো ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থার পূর্বশর্ত। আর্ত-মানবতার সেবা, শিক্ষার বিস্তার, মানুষের অধিকারের পক্ষে বলাসহ মানুষের জন্য কাজ করাই তো যে কোনো সমাজ-কর্মীর কাজ।

'আদর্শ' প্রতিষ্ঠা বা নাম-যশের চিন্তা না করেই সমাজের জন্য কাজ করা উচিত। কোনো আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যারা সমাজ কাজ করবে তাদের এই কাজের বিষয়ে শতভাগ অকৃত্রিম হতে হবে।

পবিত্র কোরআনে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"তোমরাই হচ্ছো সর্বোত্তম জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্যেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" [আলে ইমরান: ১১০]

এই আয়াতের মর্মানুযায়ী মানুষের কল্যাণ সাধনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টাই হলো

মুসলিম জাতির টিকে থাকার অজুহাত (excuse) বা বৈধতা। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, মানুষকে একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুষম বিশ্বব্যবস্থার নেতৃত্ব দেয়ার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

সূরা বাকারার ৩০ নং আয়াতটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য,

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে যাচ্ছি।"

এই আয়াতের অর্থ অপরাপর মানুষের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নয়, বরং মানুষের সেবা করা, তাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য কাজ করা। কোরআন শরীফের অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

"আমি অবশ্যই আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি।" [বনী ইসরাইল: ৭০]

অতএব, যেখানে যে কারণে আদম সন্তান তথা মানুষ ও মানবিকতা বিপর্যস্ত ও ভূলুণ্ঠিত; সেখানে তা দূর করে মানুষের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর খলিফা হিসেবে প্রত্যেক মুসলমানের জরুরি দায়িত্ব।

(৩) ইসলামী আন্দোলনের থার্ড লেভেল: মধ্য স্তর

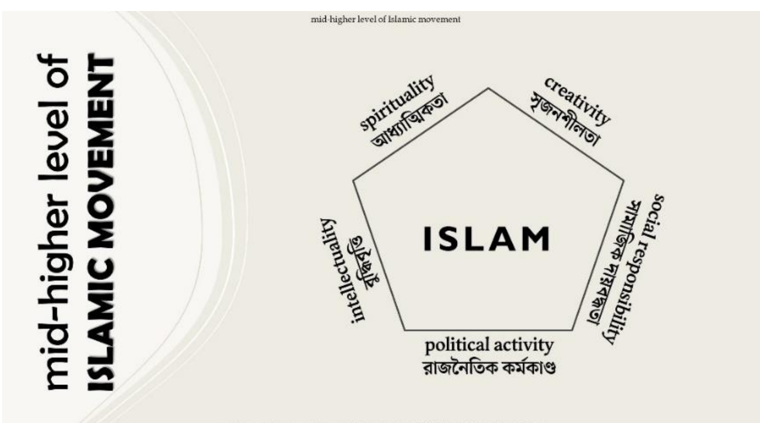

বুদ্ধিবৃত্তি, আধ্যাত্মিকতা, মননশীলতার সাথে সামাজিক দায়বোধ যখন কোনো দল বিশেষের কাজের মধ্যে সমন্বিত (integrated) হবে তখন সেই ব্যক্তিবর্গ বা দল রাজনৈতিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

রাজনৈতিক হিসেবে গড়ে ওঠা বলতে বুঝায় সাধারণভাবে যা ভালো তার পক্ষে বলা বা এ জন্য উচ্চ-কণ্ঠ হওয়া। এটি সামাজিক দায়বোধের অনিবার্য বহিঃপ্রকাশ বা পরিণতি। যখন এই ভালো মনে করা বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন হওয়া কিম্বা মন্দ কাজগুলোর প্রতিরোধ হওয়া উচিত- এমনটা দাবি করা হবে; তখন বিষয়গুলো নিছক ব্যক্তিগত পর্যায়কে অতিক্রম করে পুরো সমাজ এবং রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে।

এ ধরনের ব্যক্তিগত ঔচিত্যবোধের (sense of obligation) সামাজিক প্রয়োগযোগ্যতার প্রসঙ্গ আসলে, তাকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বলা যায়।

এখানে বলে রাখা ভালো, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড মানে এই নয় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে বা হরতাল-অবরোধ-মিছিল-মিটিং করতে হবে। আবার, নির্বাচন বা হরতাল-অবরোধ-মিছিল-মিটিং করা যাবে না, সেটাও নয়। রাজনীতিকে বিদ্যমান নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দেখলে হবে না। বরং দেখতে হবে নৈতিকতার সর্বোচ্চ পর্যায় হিসেবে। কেননা, রাজনীতি সমাজের ভালো-মন্দ নিয়ে সামগ্রিকভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে।

এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

"তোমরাই হচ্ছো সর্বোত্তম জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্যেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে।" [আলে ইমরান: ১১০]

এ সংক্রান্ত আরো অনেক কোরআনের আয়াত ও হাদীস আছে। এই বিশেষ আয়াতটিতে 'মানুষের কল্যাণের জন্যেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে' বলেই কিন্তু শেষ করা হয়নি। বরং মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত হওয়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যখন 'তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে' তখনই কল্যাণ নিশ্চিত হবে।

ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায়ের নিষেধ সংক্রান্ত এই নীতিকে কার্যকর করার

জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা বা রাষ্ট্রক্ষমতা অপরিহার্য।

যখন ইসলামী মতাদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত কোনো সামাজিক আন্দোলন বিশেষ কোনো রাজ্য, রাষ্ট্র বা এলাকায় 'রাজনৈতিক বিষয়ে' মতপ্রকাশ বা প্রচারণা চালাবে ও নানাবিধ প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমে সক্রিয় থাকবে, শাসনক্ষমতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত ইসলামী আন্দোলন থার্ড লেভেল বা মধ্য স্তরে রয়েছে বলে গণ্য হবে।

জ্যামিতিক গঠনের দিক থেকে ইসলামী আন্দোলনের এই পর্যায়কে আমরা সমবাহু পঞ্চভুজের সাথে তুলনা করতে পারি।

(৪) ইসলামী আন্দোলনের ফোর্থ লেভেল: উচ্চ স্তর

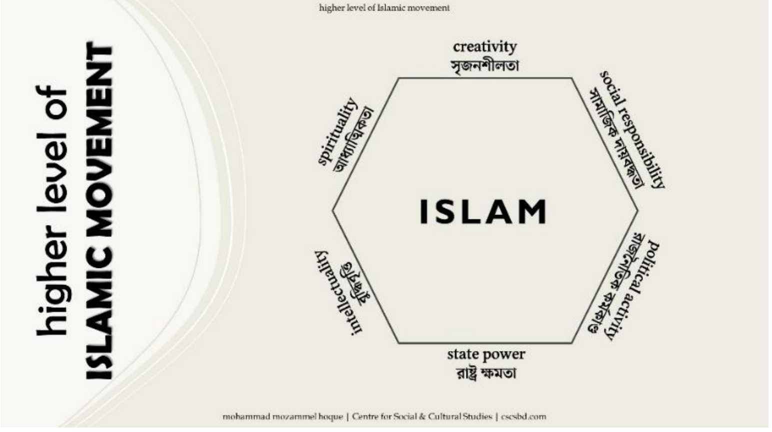

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দলকে আন্দোলনের উচ্চ পর্যায়ে উপনীত করে। ভালোর বাস্তবায়ন এবং মন্দের প্রতিরোধ, জনকল্যাণ সাধন এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের ইতোমধ্যে ঘোষিত সামাজিক লক্ষ্যসমূহকে বাস্তবায়নের জন্যে এই আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ বা দলবিশেষ এক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জনপদের শাসনকর্তৃত্বের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে।

ইসলামী আন্দোলনের ইতোপূর্বকার সমবাহু পঞ্চভুজ মডেলটা এ পর্যায়ে এসে ষড়ভুজে উন্নীত (evolved) হবে। বলা বাহুল্য, বুদ্ধিবৃত্তি, আধ্যাত্মিকতা, মননশীলতা, সামাজিক দায়বোধ, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার অপরাপর বৈশিষ্ট্যসমূহও উক্ত ব্যক্তিবর্গ বা দলের মধ্যে যথাযথভাবে সক্রিয় থাকবে।

ইসলামী আন্দোলনের প্রচলিত ধারার সাথে পার্থক্য

ইসলামী আন্দোলনের প্রচলিত ধারার সাথে এই মডেলের পার্থক্য হচ্ছে,

১। প্রচলিত ধারায় আন্দোলনের কাঠামো হলো ক্রমসোপানমূলক (hierarchical)। মোটা দাগে যার স্তরগুলো হলো: দাওয়াত, সংগঠন, প্রশিক্ষণ, সমাজসেবা ও রাজনীতি। একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী প্রস্তাবিত এই নতুন ধাঁচের ইসলামী আন্দোলনের কাঠামো সমতলধর্মী ও বিশেষায়িত প্যাটার্নের।

২। প্রচলিত ধারায় আন্দোলনের কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়ার জন্য এলাকাভিত্তিক ইউনিট ও শাখা কায়েম করা হয়। ইসলামী আন্দোলনের এই নতুন ধারায় পেশাগত অবস্থান ও কাজের ক্ষেত্র নির্ণয়ের ব্যাপারে পটেনশিয়ালিটি ও চয়েসকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

৩। প্রচলিত ধরনের ইসলামী আন্দোলন ক্যাডার সিস্টেমে চলে, যেখানে কিছু কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট ‘পরিশুদ্ধ জায়গা’ তৈরি করে সেখানে ব্যক্তিকে কনফাইন্ড করে সংশোধনের চেষ্টা করা হয়। এটি অকার্যকর পদ্ধতি।

তাই এখনকার ইসলামী আন্দোলনে সমাজের মধ্যে স্বাভাবিক জীবনে থেকেই ব্যক্তির অর্গানিক ডিভেলপমেন্টকে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

সর্বাত্মকবাদী বা সংগঠনবাদী প্রচলিত ধরনের কেন্দ্রীভূত ইসলামী আন্দোলন ব্যবস্থার ভালো-মন্দ কিম্বা সাফল্য-ব্যর্থতা পর্যালোচনার চেয়ে বর্তমান সময়ের জন্য উপযোগী ইসলামী আন্দোলন তথা ইসলামী মতাদর্শভিত্তিক সামাজিক আন্দোলনের একটি রূপরেখাটি উপস্থাপন করা এই আলোচনার লক্ষ্য। আসুন, আমরা সেটাতেই মনোনিবেশ করি।

কোনো ব্যক্তিবর্গ বা দলবিশেষের পরবর্তী ধাপে উন্নীত হওয়ার মানে হলো, যারা শুরু করেছিলো বা আগের ধাপে ছিল তাদের একটা অংশ পরবর্তী ধাপের বিশেষ ধরনের কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে। যেমন, রাষ্ট্রীয় কাজে যারা জড়িত থাকবে তাদের সাথে রাজনৈতিক দলের এক প্রকার যোগাযোগ থাকলেও এতদুভয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও দূরত্ব থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রশাসন এবং দল এই দুটো কখনো একাত্ম হতে পারবে না।

আলোচ্য ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ ও ষড়ভুজ মডেলসমূহের ক্ষেত্রে প্রতিটি বাহু এবং কোণ সমান। অর্থাৎ প্রত্যেকটা দিকের কাজের গুরুত্ব একই রকম।

সমাজে যারা রাজনৈতিক কাজ করবে, তাদের জন্যে আন্দোলনের অপরাপর অংশের কর্মীরা হচ্ছেন পরোক্ষ সহযোগী মাত্র। রাজনীতির ময়দানে রাজনৈতিক কর্মীরাই মূখ্য ভূমিকা পালন করবে। বুদ্ধিবৃত্তি, আধ্যাত্মিকতা, মননশীলতা ও সমাজসেবামূলক সেক্টর থেকে তারা সময়ে সময়ে সহযোগিতা পাবে।

অন্যদিকে, যারা সামাজিক কাজ করবে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ কর্মীরাই আন্দোলনের মূল অংশ। রাজনীতি, বুদ্ধিবৃত্তি, আধ্যাত্মিকতা, মননশীলতা বা সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি সামাজিক আন্দোলনে তাদের সহযোগী মাত্র।

আবার, সাহিত্য-সংস্কৃতি, মননশীলতা, বিনোদন ইত্যাদি নিয়ে যারা কাজ করবে, তাদের দিক থেকে তারাই হলো আন্দোলনের মূল অংশ। আর ধর্ম, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, শিক্ষা, রাজনীতি, সামাজিক কাজ— এগুলো তাদের সহযোগী। একইভাবে, যারা ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবে তাদের ফোকাস এবং ডেভেলপমেন্ট হবে শুধুমাত্র দ্বীনি বিষয়ে। রাজনীতি, মননশীলতা, বুদ্ধিবৃত্তি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার ব্যাপারে তারা সচেতন থাকবে এবং প্রয়োজন অনুসারে সহযোগিতা করবে; কিন্তু সরাসরি সম্পৃক্ত হবে না।

তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে জড়িতরা অন্যান্য বিষয়ের সাথে সরাসরি জড়িত হবে না। বরং অন্যান্য বিষয়ের সাথে পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্টতা রেখে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করবে। স্পষ্টতই তারা রাজনীতিসচেতন থাকবে এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সহায়তা করবে; কিন্তু নিজেরা কখনো প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িত হবে না।

বুদ্ধিবৃত্তি, আধ্যাত্মিকতা ও মননশীলতার উপাদানগুলোকে মৌলিক মানবীয় গঠন ও পদ্ধতি হিসেবে সবাই লালন করবে। এরপর স্বীয় যোগ্যতা অনুসারে নিজ কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়ে কর্মতৎপর হবে। আন্দোলনের এই নতুন ধারায় কোনো সেক্টরই মূল (core) নয়। তাই বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে সবাইকে কর্মবিভাজন-প্রক্রিয়া (specialization) অনুসরণ করতে হবে। যারা যে বিষয়ে প্রাগ্রসর, তারা শুধু সে বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় থাকবে এবং নিজ নিজ কাজের জন্যে দায়বদ্ধ থাকবে। তবে প্রত্যেকটা সেক্টর সময়ে সময়ে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য-সংস্কৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি, আধ্যাত্মিকতা, মননশীলতা— এগুলোর কোনোটি বাদ দিয়ে একটি ইসলামভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন পূর্ণতা পাবে না।

৩. ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একজন কর্মীর কর্মধারা

১। ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একজন কর্মীর ব্যক্তিপর্যায়ে করণীয়

Issue বিষয়	Feature বৈশিষ্ট্য	Medium মাধ্যম	Method পদ্ধতি
Intellectuality বুদ্ধিবৃত্তি	Free স্বাধীন	Education & Research শিক্ষা ও গবেষণা	Interactive দ্বিপাক্ষিক
Spirituality আধ্যাত্মিকতা	Sincere একনিষ্ঠ	Religion or Ideology ধর্ম কিম্বা মতাদর্শ	Mutual Exclusion সহাবস্থান
Creativity মননশীলতা	Free স্বাধীন	Literature, Culture, Media & Technology সাহিত্য, সংস্কৃতি, গণমাধ্যম ও প্রযুক্তি	Pro-active ইতিবাচক

(ক) বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা:

বুদ্ধিবৃত্তিচর্চা সব রকমের গোঁড়ামিমুক্ত এবং স্বাধীন বৈশিষ্ট্যের হওয়া উচিত। কেউ যদি আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে এর স্বপক্ষে যুক্তি দিতে চায়, সেক্ষেত্রে তার মতপ্রকাশের পর্যাপ্ত সুরক্ষা থাকা উচিত। পক্ষান্তরে কেউ এ ধরনের যুক্তিকে খণ্ডন করতে চাইলে তারও সে ধরনের মতপ্রকাশ ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার অধিকারের পক্ষে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা থাকা জরুরি।

বলাবাহুল্য, যে কোনো পর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় পর্যায়ের শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে হতে পারে। বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা 'একপক্ষীয় নিষ্ক্রিয় শিক্ষণ' (one sided passive learning) পদ্ধতির না হয়ে প্রশ্নোত্তর ও উভয় পক্ষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক তথা দ্বিপাক্ষিক (interactive) হতে হবে।

জ্ঞান তথা বুদ্ধিবৃত্তিচর্চা সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসের পুনঃপুন বর্ণনা হতে এটি স্পষ্ট যে যাজকতন্ত্রের বিরোধিতা করলেও ইসলাম জ্ঞানের স্পেশালাইজেশনের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে।

প্রচলিত ধারায় ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তি ও সচেতন ইসলামপন্থীদের কাছে সেসব বর্ণনা যথেষ্ট পরিচিত বিধায় সেগুলোর উল্লেখ না করে এখানে অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত কিন্তু বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট একটা আয়াত উদ্ধৃত করা হলো,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"মুমিনদের সকলে একসাথে অভিযানে বের হওয়া সমীচীন নয়। তাদের প্রত্যেক দলের একাংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অনুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে সতর্ক করতে পারে যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে।" [সূরা তওবা: ১২২]

পাশ্চাত্যের থিংকট্যাঙ্ক সিস্টেম সম্পর্কে প্রচলিত ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীদের মধ্যে এক ধরনের উন্নাসিক ভাব লক্ষ্য করা যায়। অথচ পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি হলো থিংকট্যাঙ্ক সিস্টেমের দলীল!

দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধফেরত মুজাহিদদের সমালোচনা করবে এমন লোকেরা, যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই। সূরা আসরে বলা হয়েছে, 'তারা পরস্পরকে সত্য বিষয়ে পরামর্শ দেয়'। দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞ লোকেরা অন্যদের সতর্ক করছে, এমনকি সর্বোচ্চ মর্যাদার মুজাহিদদেরকেও!

(খ) আধ্যাত্মিকতার চর্চা:

আধ্যাত্মিকতা ব্যক্তিগতভাবে চর্চার বিষয়। ব্যক্তির সমষ্টি হিসেবে দল, সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রসহ সর্বত্র একটি অন্তর্গত অপরিহার্য বিষয় হিসেবে এটি সক্রিয় থাকবে। আধ্যাত্মিকতার বৈশিষ্ট্য হলো একনিষ্ঠতা (sincerity), যার মাধ্যম হলো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান কিম্বা যে কোনো মতাদর্শগত সুনির্দিষ্ট কর্মধারা।

মুসলমানরা ইসলামের ইবাদত পদ্ধতি অনুসরণ করে আধ্যাত্মিকতা চর্চা করবে। অন্য ধর্মের অনুসারীরা স্ব স্ব ধর্মের পদ্ধতি অনুসারে আধ্যাত্মিকতা চর্চা করবে। যারা কোনো ধর্মের অনুসারী নয়, তারা নিজেদের মতাদর্শ অনুযায়ী আধ্যাত্মিকতার চর্চা করবে। আধ্যাত্মিকতা তথা বস্তু-অতিবর্তিতাকে গ্রহণ ও চর্চার ক্ষেত্রে স্বাধীন জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য থাকাই স্বাভাবিক।

কেউ অন্যের আধ্যাত্মিকতার ধরনের উপর হস্তক্ষেপ না করে সহনশীলতার পরিচয় দিবে। বৈচিত্র্যতা ও বৈপরিত্য সত্ত্বেও এই পদ্ধতি জনগোষ্ঠীসমূহের ঐক্যবদ্ধ (integrated) হয়ে বসবাসের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। এই অর্থে এটিকে একাধারে inclusive এবং mutually exclusive বলা যায়।

যারা কোনো ধর্মের অনুসারী নয়, তারা কিভাবে আধ্যাত্মিকতা চর্চা করবে? এটি একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। এক্ষেত্রে বস্তু-অতিবর্তী তথা আধ্যাত্মচেতনাকে নৈতিকতার উৎসস্থল (as the spawning ground of morality) হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

ধর্মে অবিশ্বাসীদের মধ্যেও নিজস্ব মতাদর্শের আলোকে এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক ঔচিত্যবোধ বা নৈতিক চেতনা গড়ে উঠে। যদিও ধর্মের আচার-পদ্ধতির (ritual) সাথে এর বিরোধ দৃশ্যমান। একটা আদর্শ সমাজ ও মূল্যবোধ গঠনের শর্ত হিসেবে প্রত্যেক নাগরিকের কিছু সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থাকা জরুরি।

এই আলোচনার উপসংহার হলো, নৈতিকতা ছাড়া ধর্ম হতে পারে না, কিন্তু ধর্ম ছাড়াও নৈতিকতা হতে পারে। তাই ধর্মের অনুসারীরা ধর্মের ভিত্তিতে নৈতিকতা গড়ে তুলবে; আর ধর্মে অবিশ্বাসীরা তাদের নিজস্ব মতাদর্শের আলোকে নৈতিকতা গড়ে তুলবে। যেহেতু ব্যক্তিকে ঘিরে সমাজ, তাই সমাজে মিলেমিশে থাকতে হলে প্রত্যেকের মধ্যে একটা সাধারণ ঔচিত্যবোধ গড়ে তুলতে হবে।

(গ) মননশীলতার চর্চা:

ইসলামী আদর্শনির্ভর সামাজিক আন্দোলনের সমবাহু ত্রিভুজ মডেলে বুদ্ধিবৃত্তি

ও আধ্যাত্মিকতার পরিণতি হিসেবে যে বৈশিষ্ট্যটি গড়ে উঠা অনিবার্য, তা হলো মননশীলতা (creativity)। এর মাধ্যম হতে পারে সাহিত্য, সংস্কৃতি, গণমাধ্যম, প্রযুক্তি- এই ধরনের বিষয়াবলি। মননশীলতার বৈশিষ্ট্য হবে স্বাধীন এবং এর পদ্ধতি হতে হবে ইতিবাচক বা গঠনমূলক (pro-active)।

কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে সমাজ কাঠামোকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া থাকা উচিত। ব্যক্তির সমন্বয়ে পরিবার, পরিবারের সমন্বয়ে সমাজ, সমাজ বিকাশের উচ্চস্তরে রাষ্ট্র— এরূপ ক্রমধারায় গাঁথুনিগুলোকে শক্তিশালী করে তোলা উচিত। অধস্তন কোনো একটা প্রতিষ্ঠানকে যথেষ্ট শক্তিশালী হিসেবে গড়ে না তুলে ঊর্ধ্বতন কোনো প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী বা টেকসই হতে পারে না।

পাশ্চাত্যে ভঙ্গুর পারিবারিক ব্যবস্থা সত্ত্বেও এক ধরনের সুষম সমাজ গড়ার একটা প্রচেষ্টা এবং নির্দিষ্ট মাত্রায় এক ধরনের দৃশ্যমান সফলতা আমরা দেখি। মানবিকতার বেশ কিছু দিকের কার্যকর সফলতা সত্ত্বেও সেখানকার সমাজ ও রাষ্ট্রের কতিপয় মৌলিক অসামঞ্জস্যতা লক্ষ করা যায়।

সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক কার্যক্রমগুলোকে রক্ষণশীলতা বা উদারতার প্রান্তিকতা হতে না দেখে, এটা যেন সমাজ গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে, সেদিকে লক্ষ রাখা উচিত। তাই এখানে ধর্ম নিতান্তই প্রাসঙ্গিক একটা বিষয়। অপরিহার্য বিষয় হলো সমাজ গঠনে ধর্ম, সংস্কৃতি ও রাজনীতিসহ সব অনুষঙ্গের ইতিবাচক ভূমিকা পালন।

অবশ্য এসব ক্ষেত্রে এমন মাত্রায় স্বাধীনতার অনুমোদন থাকা উচিত নয়, যার ফলে মননশীলতা চর্চার নামে তা সমাজের ক্ষুদ্র কিম্বা বৃহত্তর কোনো জনগোষ্ঠীকে আহত করে। এ ধরনের তথাকথিত স্বাধীনতা চর্চা কারো জন্যে সুখকর হলেও অন্যান্যদের জন্য কষ্টের কারণ হতে পারে। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ তৎকালীন সময়ে ইতালি ও জার্মানীর জনগণকে উজ্জীবিত করলেও পৃথিবীর অন্যান্য জনগণের জন্যে তা ব্যাপক ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হয়েছিল।

সুতরাং মননশীলতার জন্যে ইতিবাচকতার শর্তারোপ (parameter) করতে হবে। কাণ্ডজ্ঞানের উপর নির্ভর করে এই ইতিবাচকতা নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ

সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পরিস্থিতির আলোকে নির্ধারিত হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি (performance) ইতিবাচক হিসেবে বিবেচিত হবে কিনা।

২। ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একজন কর্মীর সামাজিকভাবে করণীয়

Feature বৈশিষ্ট্য	Medium মাধ্যম	Method পদ্ধতি
Humanitarian মানবিক	Life & Environmental Security জীবন ও পরিবেশের নিরাপত্তা	Participatory অংশগ্রহণমূলক

ব্যক্তিগত পর্যায়ের আলোচ্য তিনটা কাজের সমন্বয়ের পর সামাজিক দায়বদ্ধতার উৎপত্তি ঘটে। বিশেষ করে ইসলামের দিক থেকে বিবেচনা করলে, মানবিক চেতনার আলোকে সমাজের জন্যে কাজ করতে হবে। কোরআনে আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে 'রব্বুল আলামীন', রাসূলকে (সা.) বলা হয়েছে 'রহমাতুল্লিল আলামীন'।

সুতরাং সকল সৃষ্টির জন্যেই মানবিক দৃষ্টিকোণ পোষণ করা উচিত। মানুষের জন্যে তো বটেই, বস্তুজগৎসহ সকল সত্তার অস্তিত্বের প্রতি ইতিবাচক, গঠনমূলক, সহমর্মিতা ও সমতার দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত।

জীবন ও পরিবেশের নিরাপত্তাকে অক্ষুন্ন রাখার মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করতে হবে। আর সমাজসেবার পদ্ধতি হবে অংশগ্রহণমূলক অর্থাৎ এতে প্রত্যেক ব্যক্তি ও গ্রুপ- সকলেরই অংশগ্রহণের মনোভাব থাকা উচিত।

শুধু ধনীরা সমাজসেবায় অংশগ্রহণ করবে তা নয়, বরং গরীবরাও বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করবে- হোক তা কম বা বেশি। অনুগ্রহ নয়, বরং দায়িত্বানুভূতি থেকে এ কাজে সবাই অংশগ্রহণ করবে। এ সংক্রান্ত একটি হাদীস মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে,

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ قَالَ كُنَّا نُحَامِلُ قَالَ فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ قَالَ وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَىْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ

عَنْ صَدَقَةِ هَذَا وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلاَّ رِيَاءً فَنَزَلَتْ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّ
عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ

"আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বোঝা বহনকারী শ্রমিক ছিলাম, আমাদেরকে দান-খয়রাত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। অতঃপর আবু আকীল অর্ধ সা' পরিমাণ সদকা করলো এবং আরেক ব্যক্তি এর চেয়ে কিছু বেশি নিয়ে আসলো। মুনাফিকরা বলতে লাগলো, আল্লাহর কাছে সামান্য দানের কোনো মূল্য নেই এবং তিনি এর মুখাপেক্ষীও নন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি (আবু আকীল) শুধু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই দান করেছে। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হলো: 'যারা বিদ্রুপ করে স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা প্রদানকারী মুমিনদেরকে, আর তাদেরকে যাদের পারিশ্রমিক ছাড়া অন্য কোনো আয় বা সামর্থ নাই।' (সূরা তওবা: ৭৯)।" [সহীহ মুসলিম, তৃতীয় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত]

সহযোগিতামূলক কাজের ক্ষেত্রে কোনো আদর্শ বা দলীয় দৃষ্টিকোণ নয়, বরং মানবিক দৃষ্টিকোণকে বিবেচনা করতে হবে। কোনো মুসলমান কাউকে স্রেফ মুসলমান বলেই সাহায্য করবে না, বরং মানুষ বলেই তাকে সাহায্য করবে। তেমনি একটা প্রাণীকেও সাহায্য করবে আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে। সূরা ফোরকানের ৬৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা অকারণে কোনো প্রাণ হত্যা করে না।'

৩। ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একজন কর্মীর প্রত্যাশিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপ্রচেষ্টা

Feature বৈশিষ্ট্য	Method পদ্ধতি
Free অবাধ	Multi Party বহু দলীয়

ব্যক্তিগত ও সামাজিক কাজগুলোর পরবর্তী ধাপ হচ্ছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। সমাজের সকল স্তরে রাজনীতি নিয়ে যে ধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে,

সেদিকে না তাকিয়ে খোলা মনে বুঝতে হবে যে সামাজিক আন্দোলনে রাজনীতি কেন প্রাসঙ্গিক। ব্যক্তিগত বা অরাজনৈতিক দল গঠন করে সামাজিক কল্যাণের যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, এর বিপরীতে বিদ্যমান নেতিবাচক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এই প্রচেষ্টাকে সহজেই নস্যাৎ করে দিতে পারে।

অন্যদিকে, ইতিবাচক ও সহযোগিতামূলক রাজনীতি সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ অতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে পারে। সুতরাং সমাজের যে চালিকা শক্তি রয়েছে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তার কার্যকর সহযোগীর ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সবার জন্যে ভালো, সর্বোচ্চ কল্যাণ, অন্যায় ও অপকর্ম প্রতিরোধের যেসব কথা আমরা বলি সেগুলোই হলো রাজনীতি। রাজনীতির চর্চা হওয়া উচিত অবাধ এবং সর্বাবস্থায় বহুদলীয় পদ্ধতিতে। রাজনৈতিক দল গঠন, নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিরোধী দলীয় ভূমিকা পালন- এসব ব্যাপারে অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। আদতে এ ধরনের মনোভাব অমূলক।

সর্বাবস্থায় সমানভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান না হলে, প্লুরালিজম না থাকলে; সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্তরা তাদের নিজস্ব দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যাবে। কিম্বা এক সময় তারা এমন একটা কাঠামোর মধ্যে নিজেদের বেঁধে ফেলবে, যা থেকে নিজেরা তো বটেই, দেশ-জাতি কেউ বের হতে পারবে না। এর পরিণতি হবে total destruction, সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রগুলোর পতনের ফলে যা আমাদের সামনে স্পষ্ট।

তাই ইসলামভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে বা ক্ষমতায় যাওয়ার আগে-পরের কোনো অবস্থায় যেন সর্বাত্মকবাদী রূপ লাভ না করে, সেজন্যে ব্যক্তি বা দল— উভয় পর্যায়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকা উচিত। আর বাকপ্রকাশের এই স্বাধীনতার পূর্বশর্ত হচ্ছে বহুদলীয় ব্যবস্থা।

৪। রাষ্ট্র সম্পর্কে ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একজন কর্মীর প্রত্যাশিত দৃষ্টিভঙ্গি

Issue বিষয়	Feature বৈশিষ্ট্য	Method পদ্ধতি
Law & Administration আইন ও প্রশাসন	Qualified যোগ্য	Equality & Accountability সমতা ও জবাবদিহিতা
Economic System অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা	Equitable সুষম	Integrated সমন্বয়মূলক
Armed Forces সশস্ত্র বাহিনী	Skilled & Moral যোগ্য ও নৈতিক	Mass Defense গণ প্রতিরক্ষা

যে সকল ব্যক্তিবর্গ বা দল, ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের কর্মধারাকে ন্যূনতম মানে আঞ্জাম দেয়ার পর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে; তারা এক পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে উপনীত হয়। এ জন্য রাষ্ট্র সম্পর্কিত আলোচনা জরুরি।

রাষ্ট্র সম্পর্কিত নানাবিধ আলোচনা হতে পারে। আইন ও জনপ্রশাসন, অর্থনীতি এবং সশস্ত্র বাহিনী পরিচালনার কাজগুলো এমন যে শাসনতান্ত্রিক বা রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন ছাড়া তা সম্ভব নয়। এই দৃষ্টিতে এগুলোকে রাষ্ট্রক্ষমতার অনুষঙ্গ বলা যায়।

(ক) আইন ও প্রশাসন:

সবাই আইন মেনে চলে। কিন্তু আইন তৈরি করতে হলে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকা চাই, তা যে ফরম্যাটেই হোক না কেন। ইসলাম একটি গুণবাচক বিষয় হওয়ায় আইনসভার প্রচলিত আকারগুলোর কোনোটাই ইসলামবিরোধী নয় অর্থে ইসলামসম্মত। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বা গত্যন্তর নাই এমন অবস্থায় পরিমাণগত বিবেচনা তথা সংখ্যাধিক্যও গ্রহণযোগ্য। সেক্ষেত্রে পরিমাণকে এক ধরনের গুণ হিসেবে ধরা হয়।

ইসলামী মতাদর্শের আলোকে পরিচালিত রাষ্ট্রের জনপ্রশাসন-কাঠামো যোগ্যতার ভিত্তিতে গড়ে তোলা উচিত; কোনো ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা মতাদর্শের ভিত্তিতে নয়। আর এর পদ্ধতি হবে সমতা ও জবাবদিহিতা। জনপ্রশাসনে জবাবদিহিতার

প্রাসঙ্গিকতা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এখানে সমতার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পর্যায়ে কর্তব্যরত ব্যক্তি উভয়ই জনগণের সেবক, তাদের আচরণের মধ্যে এই চেতনা বজায় থাকতে হবে। তাহলে জনপ্রশাসনের মধ্যে সমতা কাজ করবে। এছাড়া তাদের জবাবদিহিতা শুধু ঊর্ধ্বতন প্রশাসনের কাছে নয়, জনগণের কাছেও থাকতে হবে।

(খ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা:

অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কর ব্যবস্থা, মুদ্রানীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য, ঋণ ব্যবস্থা, কৃষি-শিল্প ইত্যকার অনেক বিষয় আছে যেগুলো শুধু রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধনের জন্যে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে যে বিষয়গুলো থাকা দরকার তার মধ্যে অর্থনীতি একমাত্র কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। তবে তালিকার শুরুতেই অর্থনীতি থাকবে, তা নিয়ে বোধকরি কারো দ্বিমত নাই।

ইসলামী মতাদর্শভিত্তিক পরিচালিত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনার বৈশিষ্ট্য হবে সুষম। সুষম বলতে, সমাজের বা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কল্যাণের প্রক্রিয়া বুঝানো হচ্ছে। জনগণের জন্য এটা নিশ্চিত করতে হবে। এটা করতে গিয়ে অর্থনীতি কি পুঁজিবাদী হবে, নাকি সমাজতান্ত্রিক কিম্বা কল্যাণধর্মী হবে- সেদিকে না গিয়েই বলা যায়, ইসলাম কিছু মৌলিক নীতিমালা দিয়েছে, সে অনুসারে স্থান-কাল-সময়ের ভিন্নতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মডেল তৈরি সম্ভব।

মানুষের বৃহত্তর কল্যাণ বিবেচনায় যে কোনো মতবাদের ইতিবাচক দিকগুলোর সমন্বয় করা যেতে পারে, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক নীতি হবে সমন্বয়মূলক। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে সমাজের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধন করাই অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের মূল লক্ষ হওয়া উচিত।

(গ) সশস্ত্র বাহিনী:

সশস্ত্র বাহিনীর বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত দক্ষ, এ ব্যাপারে সবাই মোটামুটি একমত।

কিন্তু সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে যদি নৈতিকতা না থাকে, তাহলে জনগণ ও রাষ্ট্র উভয়ের জন্যে এক পর্যায়ে তা অকল্যাণ বয়ে আনবে। যেমন: মিলিটারি ক্যু। এই ধরনের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ ও সশস্ত্র বাহিনীর পেশাগত উৎকর্ষতা সাধনের জন্যে টেকসই নৈতিকতা জরুরি।

এছাড়া সকল নাগরিককে সামরিকভাবে প্রশিক্ষিত করে গণপ্রতিরক্ষা নীতির মাধ্যমেও সশস্ত্র বাহিনীতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৪. দ্বীন ও শরীয়াহর পারস্পরিক সম্পর্ক ও পার্থক্য

প্রাসঙ্গিকতা

দ্বীন হিসেবে ইসলাম হলো আক্বিদা, দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব। এটা ঈমানের সাথে সম্পর্কিত। আর শরীয়াহ হচ্ছে দ্বীনের প্রায়োগিক দিক। অর্থাৎ কিভাবে সমাজে দ্বীন বাস্তবায়ন করা হবে, সেই ব্যাপার। দ্বীন হচ্ছে ইসলামের অপরিবর্তনীয় বিষয়।

শরীয়াহ হলো বিধি-বিধান (rules & regulations)। কোনো সমাজের গ্রহণ-ক্ষমতার (conceivability) উপর শরীয়াহর প্রয়োগ নির্ভর করবে। দ্বীন ও শরীয়াহর এই সম্পর্ককে বুঝার জন্য সূরা শূরার ১৩ নং আয়াত প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

“তিনি তোমাদের জন্য সেই দ্বীনই নির্ধারিত করেছেন যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং যা এখন আমি তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি। আর যার আদেশ দিয়েছিলাম আমি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে। তার সাথে তাগিদ করেছিলাম এই বলে, এই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং এ ব্যাপারে অনৈক্য

সৃষ্টি করো না।”

আল্লাহ তায়ালা বেশ কয়েকজন রাসূলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলছেন, সব নবী-রাসূলকে আদ-দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করেছেন এবং এর ফরজিয়াত সম্পর্কে কোনো প্রকারের দ্বিমত করা যাবে না। এই দৃষ্টিতে সব নবী-রাসূলের দ্বীন একই, যদিও তাঁদের শরীয়াহ ভিন্ন ভিন্ন।

দ্বীন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

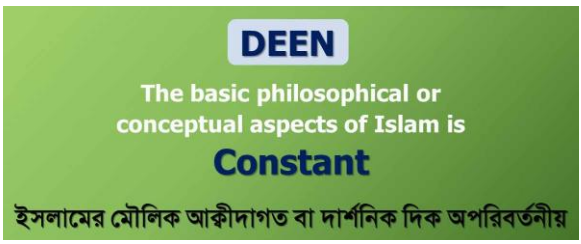

দ্বীন হলো ঈমান তথা এক বিশেষ বিশ্ব-দৃষ্টি (world-view); যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর মহান সত্তা এবং এই সত্তার এককত্ব ও অনন্যতাসহ অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যাবলি, রিসালাত ও আখিরাতের প্রাসঙ্গিকতাসহ যাবতীয় তাত্ত্বিক বিষয়ের মৌল-কাঠামো। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম।” [আলে ইমরান: ১৯]

সূরা কাফিরুনের শেষ আয়াতে বলা হচ্ছে,

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আমাদের জন্য আমাদের দ্বীন।”

অথচ বিদায় হজ্বের সময় কোরআনের এই আয়াত নাযিল হলো,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পূর্ণতা দান করলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করলাম। এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।” [সূরা মায়েদা: ৩]

দ্বীন যদি দশম হিজরীতে পূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে মক্কী যুগের সূচনা-লগ্ন থেকে পরবর্তীতে যে দ্বীন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে কি অসম্পূর্ণতার কোনো প্রমাণ বা ইঙ্গিত ছিলো? এই প্রশ্নের উত্তর যদি না-বোধক হয়, তাহলে বুঝতে হবে, সূরা মায়িদার ৩নং আয়াতে দ্বীনের পরিপূর্ণতা নিয়ে বলার বিষয়টি মূলত প্রায়োগিক-কাঠামোগত দিক থেকে বিবেচনা করতে হবে। দ্বীনের প্রায়োগিক পূর্ণতা তথা বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা অর্থে শরীয়াহ’র পূর্ণতা এমনকি খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও অব্যাহত ছিলো।

আল্লাহর রাসূল (সা.) যে পূর্ণতা দিয়ে গেছেন তা মৌল-কাঠামোগত (foudational) পূর্ণতা। আর সাহাবীগণ খিলাফতের দায়িত্বপালন করতে গিয়ে যা করেছেন তা সবিশেষ (superstructural) পূর্ণতা।

শরীয়াহ’র কাঠামোগত পূর্ণতা দানে তাঁদের বৈধতা ও কর্তৃত্বের পক্ষে রাসূল (সা.) এর এই হাদীসটি দলীল, যেখানে তিনি বলেছেন,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَآءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِيْنَ

“তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নত ও আমার হেদায়েতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নত অনুসরণ করবে, দাঁতে দাঁত দিয়ে তা আঁকড়ে ধরবে।” [আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ]

বৃহত্তর দৃষ্টিতে শরীয়াহও ইসলামের তথা দ্বীনের অংশ, যদিও তা মৌলিক আক্বীদাগত যে ইসলাম অর্থাৎ দ্বীনের অনিবার্য পরিণতি। মান্যতার দিক থেকে উভয়ই অপরিহার্য তথা সমগুরুত্বের। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গরীবের জন্য হজ্ব ও যাকাতের মান্যতাকে স্বীকার করা অপরিহার্য, যদিও এই আমলগুলো তার জন্য প্রযোজ্য নয়। যেখানে জিহাদ ঘোষণার বৈধ কর্তৃপক্ষ নাই সেখানকার মুসলমান অধিবাসীরা জিহাদের ফরজিয়াতকে শুধুমাত্র তাত্ত্বিকভাবে মানবে, বাস্তবে নয়।

শরীয়াহ সম্পর্কে ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি

রাষ্ট্র যেহেতু সামাজিক ব্যবস্থার একটা ঊর্ধ্বতন বিবর্তন প্রক্রিয়া বা উচ্চতর ধাপ, তাই যে সমাজ যে ধরনের ও মানের রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনার উপযোগী, সেই সমাজের সদস্যবৃন্দ তদনুরূপ রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে কাজ করবে। সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা হতে পশ্চাদগামী বা অগ্রগামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি গ্রহণ করা রাষ্ট্রের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি বিরোধী ও হঠকারিতার নামান্তর মাত্র।

সংশ্লিষ্ট সমাজ ব্যবস্থা যদি রাষ্ট্র ব্যবস্থার ন্যূনতম বা উচ্চতর মানের জন্য তৈরি না থাকে, সেই সমাজের মুসলিম সদস্যদের আশু কর্তব্য হলো ইসলামসম্মত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়মাবলির উপযোগিতাকে তত্ত্ব ও বাস্তবগত দিক থেকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে সমাজের কাছে তুলে ধরা এবং তদনুযায়ী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করা।

এটিই হলো ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মধারা।

৫. সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্তঃসম্পর্ক

আমরা জানি, সমাজ হতে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে বা রাষ্ট্রব্যবস্থা সর্বদাই সামাজিক কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। আর ইসলামী শরীয়াহর প্রয়োগযোগ্যতা যেহেতু সমাজ হতে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত, তাই সমাজ ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত কিছু মৌলিক আলোচনা দরকার।

ইসলামের রাষ্ট্র ধারণা

Political power and authority in favor of
ISLAM
ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব

Traditionally claimed as
'ISLAMIC STATE'

সমাজ ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত আলোচনার আগে ইসলামী রাষ্ট্র বলতে কী বুঝায়, তা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা বলতে এমন এক ধরনের কর্তৃত্বকে বুঝায়, যা ইসলামের তরফ থেকে প্রাপ্ত বিষয়গুলোকে সমাজ ও রাষ্ট্রে ধারণ, প্রয়োগ ও চর্চা করে এবং এগুলোকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।

প্রচলিত অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র বলতে ইসলামপন্থী দল বা গ্রুপের ক্ষমতা গ্রহণকে বুঝায়।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা কি ইসলাম অনুসারীদের ওপর ফরজ?

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ইসলাম অনুসারীদের ওপর ফরজ কিনা – এ প্রশ্ন দিয়ে আলোচনাটা শুরু হতে পারে। এ ব্যাপারে বলা যায়, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বা ফরজিয়াত নির্ভর করবে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সমাজব্যবস্থারই পরিণতি ও প্রতিচ্ছবি হচ্ছে রাষ্ট্র, তাই কোনো সমাজ ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের উপযুক্ত হলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি গ্রহণ করা সংশ্লিষ্ট সামাজিক আন্দোলনের জন্য অপরিহার্য।

পক্ষান্তরে রাষ্ট্র গঠনের জন্যে যেখানকার সমাজ উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি সেখানকার আন্দোলনের জন্য রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ অনুচিত। বরং বিদ্যমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে মানিয়ে নিয়ে সম্ভাব্য সকল দিক থেকে সামাজিক পুনর্গঠনের কাজকে যথাসম্ভব এগিয়ে নেয়া উচিত।

সামাজিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার ‘বটম-আপ এপ্রোচ’-এর গুরুত্ব ও কার্যকারিতা

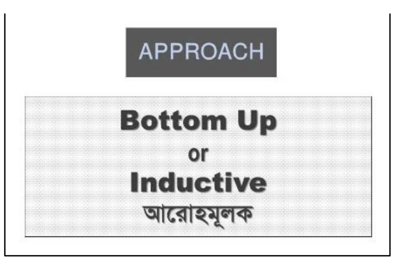

সামাজিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সামাজিক আন্দোলনকে রাষ্ট্র ক্ষমতার দিকে পরিচালিত করে। বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে কোনো জনপদে বা জনগোষ্ঠীর

জন্য ন্যূনতম মানে উপযোগী রাষ্ট্রব্যবস্থা কার্যকর নাও থাকতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতি নির্বিশেষে জনগোষ্ঠী মাত্রেরই কোনো না কোনো ধরনে সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব অনিবার্য।

সমাজের আকাঙ্ক্ষা ও আদলেই যেহেতু রাষ্ট্র গড়ে উঠে সেহেতু বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে সমাজনির্ভর থাকে বা থাকতে বাধ্য। অতএব, যখনই কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা সমর্থনকারী সমাজব্যবস্থা হতে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখনই সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকে থাকার বৈধতা হারায়।

এই দৃষ্টিতে রাষ্ট্রগঠন ও এর অব্যাহত অগ্রগতির এই এপ্রোচটা হলো নিচ থেকে গড়ে উঠে ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে যাওয়া, ইংরেজিতে যাকে 'বটম-আপ এপ্রোচ' বলে। ঠিক যেভাবে একটা বিল্ডিং তৈরি হয় ও তা টিকে থাকে। যুক্তিবিদ্যার ভাষায় একে আরোহমূলক (inductive) পদ্ধতিও বলা যায়।

একটি পিরামিড যেমন বৃহত্তর ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে ক্রমান্বয়ে একটি চূড়ার দিকে ধাবিত হয়, ব্যাপারটা তেমন।

শরীয়াহ বাস্তবায়নে ক্রমধারা অবলম্বনের অপরিহার্যতা

ইসলামী রাষ্ট্র সমাজের ভেতর থেকে ক্রমধারার (gradual process) মাধ্যমে গড়ে উঠবে। সমাজ যখন ইসলামকে ধারণ করবে, ইসলামী মতাদর্শ জনপ্রিয় পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে, তখন তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ে উঠবে। সহজ কথায়, সমাজ যদি ইসলাম মোতাবেক গড়ে উঠে তাহলে রাষ্ট্রও ইসলাম মোতাবেক গড়ে উঠবে।

সুতরাং, সমাজ ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত কোনো বিষয় কোরআন ও হাদীসে থাকলেই সেটি তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, এমন নয়। দেখতে হবে, সংশ্লিষ্ট আইনটির পূর্ববর্তী ধাপটি উক্ত সমাজ কিম্বা রাষ্ট্রে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত বা বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা।

কোনো আইনের প্রয়োগ হতে বিরত থাকা সেটির ফরজিয়াতকে (অপরিহার্যতা) বাতিল কিম্বা স্থগিত করা বুঝায় না। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধানাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) যে ধরনের ক্রমধারা অবলম্বন করেছেন তা বিবেচনায় নিতে হবে।

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা.) বলেছেন, মদ হারাম ঘোষণার ব্যাপারে ক্রমধারা অবলম্বন করা না হলে লোকেরা মানতো না। চিন্তা করে দেখুন, রাসূল ও নবীদের পরে শ্রেষ্ঠতম মানবগোষ্ঠী তথা আসহাবে মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহর (সা.) মতো শ্রেষ্ঠতম ছাত্রদের জন্য 'শ্রেষ্ঠতম শিক্ষকে'র প্রত্যক্ষ উপস্থিতি সত্ত্বেও যদি ক্রমধারা অবলম্বন অপরিহার্য হয়, তাহলে বর্তমানের শিক্ষকবিহীন দূর্বলতম ছাত্রদের অবস্থা কেমন হবে, তা সহজে অনুমেয়!

প্রত্যক্ষ অহী তথা কোরআন নাযিল করার সময়ে আল্লাহ সুবহানুতায়ালা যে ধরনের ক্রমধারা অবলম্বন করেছেন, পরোক্ষ অহী বা হাদীসের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহও (সা.) সামাজিক রূপান্তর প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার দিকে লক্ষ রেখেছেন।

পূর্বাপর তথা ক্রমধারা অবলম্বন করা না হলে, এমনও হতে পারে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বের করণীয়কে শিরোধার্য করে লোকেরা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজকে অবহেলা করবে বা বাদ দিবে।

অতএব, নিরবচ্ছিন্নভাবে সমাজ ও শরীয়াহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয়কারী সামাজিক আন্দোলনসমূহ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে বিশেষ (specific) কোনো বিষয়ে ফয়সালা দিতে হবে। হতে পারে, কোনো জনপদে একটা মিশ্র পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

কোনো কোনো দিক থেকে সমাজ মক্কী যুগে, আবার কোনো কোনো দিক থেকে মাদানী যুগে। বলাবাহুল্য, অনুকূল রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে সামাজিক আন্দোলনসমূহ এককভাবে এই দায়িত্ব পালন করবে। আর অনুকূল রাষ্ট্রব্যবস্থার উপস্থিতিতেও সামাজিক আন্দোলনসমূহ প্রয়োজনুসারে সহযোগিতা বা সমালোচনা অব্যাহত রাখবে।

৬. ‘ইসলামী রাষ্ট্র’ অথবা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

ইসলামপন্থীগণ ‘ইসলামী রাষ্ট্রের’ যে সর্বাত্মকবাদী তাত্ত্বিক কাঠামো দাঁড় করিয়েছে, তা পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত মানুষদের মধ্যে এক ধরনের ভীতি সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে আমেরিকায় টুইন টাওয়ারে হামলার পরে বিশ্বব্যাপী (ইসলামী) ‘সন্ত্রাসবাদের’ বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের প্রেক্ষিতে বিষয়টি আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজনীতি হলো বিশেষ ধরনের মুয়ামালাত

একজন ঈমানদারের সকল সৎকর্মই ইবাদত। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“আমি জ্বিন এবং মানুষকে ইবাদত ভিন্ন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।” [সূরা যারিয়াত: ৫৬]

প্রাত্যহিক কাজকর্ম, প্রাকৃতিক কাজ, ঘুম, এমনকি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পর্যন্ত ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানের জন্যে ইবাদত। এ সংক্রান্ত মুসলিম শরীফের একটি হাদীস হচ্ছে,

عَنْ أَبِي، ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ

صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

“আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলের (সা.) কিছু সংখ্যক সাহাবী তাঁর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ধন সম্পদের মালিকেরা তো সব সওয়াব লুটে নিয়ে গেছে। কেননা, আমরা যেভাবে নামায পড়ি, তারাও পড়ে। আমরা যেভাবে রোযা রাখি, তারাও রাখে। কিন্তু তারা তাদের অতিরিক্ত সম্পদ দান করে সওয়াব লাভ করছে, অথচ আমাদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না।

নবী (সা.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা কি তোমাদের এমন অনেক কিছু দান করেননি, যা সদকা করে তোমরা সওয়াব পেতে পারো?

আর তা হলো প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) একটি সদকা, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার) একটি সদকা, প্রত্যেক তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ) একটি সদকা, প্রত্যেক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা একটি সদকা, প্রত্যেক ভালো কাজের আদেশ ও উপদেশ দেয়া একটি সদকা এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা ও বাধা দেয়া একটি সদকা।

এমনকি তোমাদের শরীরের অংশে অংশে সদকা রয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সদকা।

সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ তার কাম-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবে আর এতেও তার সওয়াব হবে?

তিনি বললেন, তোমরা বলো দেখি, যদি তোমাদের কেউ তা হারাম কাজে (যিনা) ব্যবহার করতো তাহলে কি তার গুনাহ হতো না? অনুরূপভাবে যখন সে তা হালালভাবে ব্যবহার করবে তাতে তার সওয়াব হবে।” [সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত]

ইবাদতের এই বৃহত্তর ব্যাখ্যার সাথে সাথে ইবাদতের একটা বিশেষ তাৎপর্যও ইসলামে রয়েছে। সে অনুযায়ী ইবাদতকে দুই ভাগ করা হয়েছে—

ইবাদত ও মুয়ামালাত।

যে ইবাদতগুলো সমাজের সাথে সম্পর্কিত, নিছক ব্যক্তিগত নয়; সেগুলো হচ্ছে মুয়ামালাত (social/public dealings)। আর যেগুলো নিছক ব্যক্তিগত, সেগুলো হচ্ছে ইবাদত (ritual)।

ইবাদতের ক্ষেত্রে নিয়ত (intention) এবং ঘোষণা (declaration) উভয়ই জরুরি। যেমন, নামাজ পড়ার সময় নিয়ত করতে হয়। পাশাপাশি তাকবীর, কেরাত, দরুদ- এগুলো যেভাবে বলা আছে, সেভাবেই পড়তে হয়।

কিন্তু সামাজিক আচরণের (public dealings) ক্ষেত্রে এগুলোকে শর্ত করা হয়নি। যেমন, যাকাত দেওয়ার সময় ‘আমি যাকাত দিচ্ছি’ এটা বলা জরুরি নয়। কোনো অন্যায়ের প্রতিরোধ করার সময় এটা বলা জরুরি নয় যে আল্লাহ বলেছেন অন্যায় প্রতিরোধ করতে, তাই আমি অন্যায় প্রতিরোধ করছি। অন্যায়ের প্রতিরোধ করলেই কিন্তু দায়িত্বটা পালন হয়ে যায়।

এই আলোচনা থেকে ইবাদত ও মুয়ামালাতের পার্থক্য স্পষ্ট হয়েছে আশা করি।

মুয়ামালাতের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, রাজনীতি হচ্ছে সামাজিক আচরণ। তারমানে রাজনীতির জন্য নিয়ত জরুরি, ঘোষণাটা জরুরি নয়।

ইসলাম ভিন্ন অপরাপর মতাদর্শগুলোর একটা সুবিধা হলো, এগুলোর কোনো একটি অংশ বা প্রস্তাবনাকে বাদ দিয়েও উক্ত আদর্শের বাদবাকি অংশকে গ্রহণ করা যায় বা সুবিধামতো সংশোধন করা যায়। অথচ তত্ত্বগতভাবে ত্রুটিহীন এবং প্রায়োগিক দিক থেকেও সম্পূর্ণ সুসামঞ্জস্য মতাদর্শ হিসেবে ইসলাম নিজেকে উপস্থাপন বা দাবি করে।

অতএব, রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি মানবজীবনের কোনো না পর্যায়ে অনস্বীকার্য বিষয় হয়ে থাকে, এবং ইসলাম যদি মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হয়ে থাকে, তাহলে ইসলামে রাজনীতি থাকবে না কেন?

যদি ইসলামী রাষ্ট্র গঠনকে বাদ দেয়া হয়, তাহলে ইসলামের তরফ থেকে সেটা আদৌ ঠিক থাকে কিনা? আলোচনার শুরুতে ‘সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ

কাজের নিষেধ' সংক্রান্ত কোরআনের যে আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, সে আদেশকে তাহলে কিভাবে সমাজে প্রয়োগ করা হবে?

'ইসলামী রাষ্ট্র' নাকি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র?

Civil State আধুনিক রাষ্ট্র	Islamic State ইসলামী রাষ্ট্র
Permissible অনুমোদনযোগ্য	At the top Not the aim

ইসলামপন্থীরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে স্বভাবতই ইসলামী নীতি-আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হবে। কিন্তু তাদের এটা বলা জরুরি নয় যে ইসলাম মোতাবেক এটি করা হচ্ছে। এখন, এই ব্যাপারটা কপটতা হয়ে যাচ্ছে কি না, প্রশ্ন উঠতে পারে।

আসলে তা হবে না।

কারণ ইসলামপন্থীরা যা করছে, তারা তা কেন করছে? এর উপযোগিতা কী? এর যুক্তি কী? কীভাবে করবে?— এ বিষয়গুলো স্বচ্ছ। এ কাজের যুক্তিগুলো স্পষ্ট।

আর এগুলো সমাজে এ জন্যই গৃহীত হবে যেহেতু তা সবচেয়ে বেশি যুক্তিপূর্ণ।

আর কোনো ইসলামী আইন যদি সবচেয়ে বেশি যুক্তিপূর্ণ (better than any other alternative) হিসেবে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা না পায়, তাহলে সমাজে জোর করে ওই আইন প্রয়োগ করা হবে হঠকারিতার (ফিতনা-ফাসাদ) নামান্তর।

কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সমাজের বিদ্যমান বাস্তবতায় যে বিকল্পগুলো থাকে, সেগুলো থেকে সমাজ যেটাকে সবচেয়ে ভালো মনে করে, সেটাকেই গ্রহণ করে। প্রশ্ন হচ্ছে, আসলেই যেটা শ্রেষ্ঠ, সেটাকেই গ্রহণ করছে? নাকি অন্য একটাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তা গ্রহণ করছে?

একটা মতাদর্শের অনুসারী হিসেবে যদি কেউ মনে করে, তার অনুসারিত মতাদর্শের কর্মপন্থাই সবচেয়ে ভালো, কিন্তু সমাজের লোকেরা তা বুঝছে না; সেক্ষেত্রে তাদেরকে এর যৌক্তিকতা তুলে ধরতে হবে। যা ভালো বা অধিক কল্যাণকর, সেটা তার নিজ গুণেই প্রকাশিত হয়।

একটা পাত্রে রাখা পানিতে বালুকণা থাকলে যেমন এক পর্যায়ে তা তলানীতে পড়ে যায়; তেমনি যা মিথ্যা, অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর; সেটা এক সময় তলিয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন,

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

"সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত। মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।" [বনী ইসরাইল: ৮১]

বলে রাখা ভালো, সমাজে কোনো আইনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে গৃহীত হয় না। আইনকে সব সময় সমাজের লোকদের উপর প্রয়োগ করতে হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, সমাজ নতুন কোনো আইনের জন্য প্রস্তুত কি না? নতুন আইনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার বিভিন্ন মাত্রা আছে।

তারমধ্যে একটা মাত্রা হচ্ছে, সমাজের সবাই উপলব্ধি করবে, এই আইনটা তাদের দরকার। অতঃপর এক প্রকারের গণসম্মতির প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট ধরনের কোনো আইন বলবৎ হবে। নতুন আইন গ্রহণ করার জন্য সমাজকে সব সময় উপযোগীও হতে হবে।

আইনের প্রয়োগযোগ্যতার ব্যাপারে এই ধরনের সামাজিক উপযোগিতা হতে পারে ঐক্যমতের ভিত্তিতে, হতে পারে সংশ্লিষ্ট আইনের যৌক্তিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

ইসলামকে যারা তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক দিক থেকে সর্বাপেক্ষা ভালো মনে করে, তারাই হচ্ছে মুসলমান। যারা এমনটি মনে করবে না, তারা মুসলমান নয়।

প্রশ্ন হতে পারে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অমুসলিমরা মুসলমানদের এইসব ব্যাপার কেন মানবে?

এর উত্তর হলো, তারা এগুলো এ জন্যই মানবে, যদি এগুলো তাদের কাছে better than any other alternative হিসেবে প্রতীয়মান হয়। এ জন্য মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে, ইসলাম যে সবচেয়ে বেশি যুক্তিপূর্ণ ও কল্যাণকর তা জনগণের কাছে বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরা। এটি করতে ব্যর্থ হলে মুসলমান হিসেবে তারা নিজেদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ বলে মনে করতে হবে।

সমাজের জন্যে কল্যাণকর লক্ষ্যসমূহ সুসমন্বিতভাবে পূরণ করার জন্যই

ইসলামভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা অর্থে ‘ইসলামী রাষ্ট্র’। সেই লক্ষ্যগুলো যদি কোনো রাষ্ট্রের প্রয়োগের মধ্যে থাকে কিন্তু নামের মধ্যে (ইসলাম) নাও থাকে, তাহলে সে রাষ্ট্রকে ইসলামসম্মত বলা যায়।

সত্যিকার অর্থেই টলারেন্ট বা ব্যালেন্সড কোনো সিভিল স্টেট এর উদাহরণ হতে পারে। অবশ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা সিভিল স্টেট মানেই যে ইসলামের জন্য সহনশীল হবে, এমন নয়। কোনো কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শ, ধর্ম বা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ থাকে। যদিও তারা অর্থনৈতিকভাবে অনেক উন্নত বা সাংস্কৃতিকভাবে অনেক আধিপত্যশীল, কিন্তু তাদের এই নেতিবাচকতার কারণে রাষ্ট্রটিকে ভারসাম্যহীন বলা যায়।

অর্থনৈতিকভাবে উন্নত বা সাংস্কৃতিকভাবে আধিপত্যশীল হওয়াই কিন্তু একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিপূর্ণতার সবটুকু নয়। যদিও এ দুটো হচ্ছে অপরিহার্য শর্ত।

তাহলে যে সিভিল স্টেটে কোনো বিশেষ জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ নাই, সে হিসেবে ইসলামের প্রতিও কোনো বিদ্বেষ নাই, যেখানে জনকল্যাণকে সার্বিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে, ন্যায় বিচারকে যথাসম্ভব পালন করা হচ্ছে; সে ধরনের একটা সাধারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

আর আমাদের প্রচলিত ধারণায় ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে রূপ আমরা কল্পনা করি, তা হচ্ছে এই ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিবর্তন বা উন্নয়নগত দিক থেকে এর পরিপূর্ণতার উচ্চতম ধাপ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা – এর কোনোটাই মুসলমানের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

ইসলাম অনুসারীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের নিষেধ এবং মানুষের জীবন ও জগতের সকল বিষয়ে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে মানুষ এবং জীবজগতের সমন্বয়ে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা।

এই লক্ষ্য পূরণের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সিভিল স্টেট হচ্ছে অনুমোদনযোগ্য সর্বনিম্ন পর্যায় (permissible lowest stage) এবং ইসলামিক স্টেট হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায় (highest stage)।

ইসলামের দৃষ্টিকোণ হতে রাষ্ট্রের শ্রেণিবিন্যাস

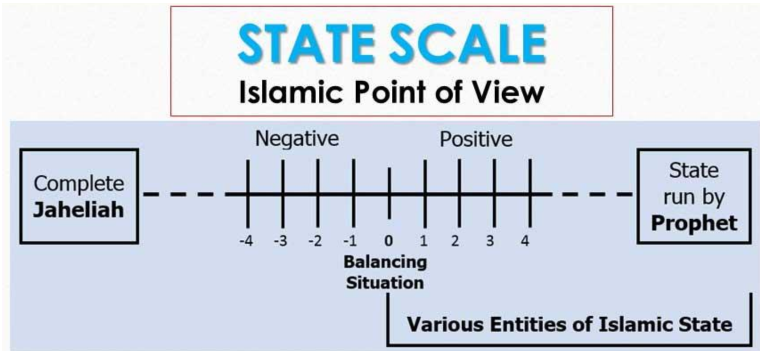

আলোচনার সুবিধার্থে একটা স্টেট স্কেলের কথা ভাবা যেতে পারে। যেটিতে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন মাত্রা দেখানো হয়েছে। এটি এমন একটা স্কেল, যার মাঝখানে শূন্য (০) পয়েন্ট আছে। স্কেলের এক পাশে -১, -২, -৩, -৪... অর্থাৎ ইসলামের জন্য সমাজ প্রতিকূল হওয়ার চূড়ান্ত পর্যায় হলো complete jaheliah।

আর বিপরীত দিকে ১, ২, ৩, ৪... অর্থাৎ ইসলামের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের আনুকূল্য বেড়ে যাওয়ার সর্বোচ্চ পর্যায় হলো state run by Prophet ।

রাসূল (সা.) মদিনাকে কেন্দ্র করে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, সেটা হলো ইসলামী রাষ্ট্রের একটা পরিপূর্ণ ও সর্বোচ্চ নমুনা। আর এর উল্টোটি হলো যেখানে কল্যাণ, ভালো, ন্যায়নীতির কোনো কিছুই বিন্দুমাত্র হাজির নেই। অর্থাৎ তাকে জাহেলিয়াত বলা যেতে পারে।

মূল আলোচনাটা হলো, যেখানে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান অর্থাৎ ইসলামের প্রতি কোনো বিদ্বেষ নাই, আবার সমাজটা ইসলাম মোতাবেকও গড়ে উঠছে না এবং ইসলামের পরিচিতিও সেখানে নাই; তাহলে কি সেই সমাজটা শূন্য? সেখানে কি কোনো নীতি-আদর্শ নাই?

অথচ সমাজ কখনোই শূন্য থাকে না। সমাজ সব সময় কোনো না কোনো নীতি বা মতাদর্শের আলোকে চলে। ইসলামের দিক থেকে দেখলে, যে রাষ্ট্রে একটা ব্যালেন্সিং সিচুয়েশন রয়েছে অর্থাৎ যেখানে ইসলাম বিদ্বেষ নাই এবং ইসলামের জন্য কোনো বাধা নাই; সেই রাষ্ট্রকে একটা গ্রহণযোগ্য সিভিল স্টেট হিসেবে

বিবেচনা করা যায়।

এ ধরনের রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর হিসেবে অনুমোদনযোগ্য হতে পারে।

আবার কোনো রাষ্ট্রে মুসলিমদের জন্য ইসলামী দণ্ডবিধি, অমুসলিমদের জন্য তাদের স্বধর্মীয় দণ্ডবিধি এবং ধর্মে অবিশ্বাসীদের জন্য স্বতন্ত্র দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার মতো পরিস্থিতিতে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা আরেক ধাপ উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছে বলা যাবে।

এভাবে এক পর্যায়ে ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নীতি-আদর্শকে আরো ব্যাপকভাবে অর্থাৎ উন্নততর বিবেচনা করে নিজেদের জন্য সাধারণ আইন হিসেবে গ্রহণ করলে, সেই সমাজ ও রাষ্ট্র আরো উন্নত স্তরের হিসেবে বিবেচিত হবে।

এই প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে রাসূল (সা.) মদীনায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে রাষ্ট্র কিম্বা সে ধরনের কোনো সম্ভাব্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো একক রূপ (model) নাই

‘ইসলামী রাষ্ট্র’ একক কোনো ব্যাপার নয় যে এটা আছে কিম্বা নাই। বরং এর অনেকগুলো পর্যায় বা ধরন হতে পারে। balancing situation বা প্রতিসম অবস্থা (zero level) থেকে শুরু করে রাসূল (সা.) পরিচালিত রাষ্ট্র পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের নানা রূপ রয়েছে।

এমনকি স্বয়ং রাসূল (সা.) মদীনায় যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারও বিভিন্ন ধাপ বা পর্যায় ছিলো। মদীনা রাষ্ট্রের প্রাথমিক পর্যায়ে সে সব আইন কার্যকর ছিলো না, যেগুলো শেষ দিকে চালু হয়েছিলো।

এই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মদীনা রাষ্ট্র তার প্রাথমিক সময়কালে ইসলামী ছিলো না, এমনটা কিন্তু নয়। বরং সর্বাবস্থায়ই তা ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবেই ছিলো। ম্যাচিউরড স্টেইজের তুলনায় এর পার্থক্যটা হলো একইসাথে গুণ ও পরিমাণের মাত্রাগত। যেমন, বিশুদ্ধ পানির মধ্যে মিষ্টতা ও পুষ্টিগত দিক থেকে তারতম্য হয়ে থাকে।

৭. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইসলামসম্মত প্রক্রিয়া

Public Participation in Decision Making Process
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জন সম্পৃক্ততা

Experts বিশেষজ্ঞ	Commoners সাধারণ
Take Decisions	Participate **Holistically & Occasionally** সময়ে সময়ে ও সামগ্রিকভাবে

কোনো সংগঠন, ইসলামভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন, প্রশাসন বা রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ‘কার্যকর জনসম্পৃক্ততার’ বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য। কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরাই সাধারণত সিদ্ধান্ত নেবেন। যারা বিশেষজ্ঞ নন, কিন্তু বিষয়ের সাথে সামগ্রিকভাবে সংশ্লিষ্ট, তারা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সময়ে সময়ে এবং সামগ্রিকভাবে অংশগ্রহণ করবেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভারসাম্য বজায় রাখতে তিনটা বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। যথা:

১. পরামর্শ

২. নেতৃত্ব ও

৩. আনুগত্য

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন–

اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

"এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আহবার (পণ্ডিত) ও রুহবানদেরকে (সন্ন্যাসী) নিজেদের রব হিসাবে গ্রহণ করেছে।" [সূরা তওবা: ৩১]

এই আয়াতের তাৎপর্য হলো, বিশেষায়িত জ্ঞানের অপরিহার্যতা সংক্রান্ত কোরআন-হাদীসের অকাট্য বর্ণনাসমূহের (নস্) বা 'মাযহাব মেনে চলা'র প্রয়োজনীয়তার ভুল ব্যাখ্যা করে আলেম সমাজের ওপর নিজেদের সোপর্দ করে দেয়া যাবে না।

অপরদিকে, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়াও সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বাস্তব জীবনে আমরা যা করি, তাই করতে হবে। যেমন, ডাক্তারের কাছে যখন আমরা যাই তখন ডাক্তারের ডাক্তারিবিদ্যাকে আমরা যাচাই করি না। কিন্তু তিনি আসলে ডাক্তার কি না, চিকিৎসা প্রদানের উপযুক্ত কি না– এসব বিষয় আমরা বিবেচনা করি।

স্মরণ রাখতে হবে, ইসলাম অনুসারে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিষয়ে দায়িত্বশীল বিধায় ইহকালীন ও পরকালীন জবাবদিহিতাও সর্বাবস্থায়ই ব্যক্তিগত। সমস্যা হলো, মানুষ ক্ষমতাপ্রয়োগ ও প্রাপ্তির দাবিকে যথাসম্ভব সম্প্রসারিত করলেও স্বীয় দায়-দায়িত্বের কর্মক্ষেত্রকে ন্যূনতম মানেরও নিচে সীমিত করার চেষ্টা করে। পবিত্র কোরআনের সূরা তাকাসুরের শেষ আয়াতে বলা হয়েছে,

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

"অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের (প্রত্যেককে) নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সত্যিকার অর্থে কোনো এক ব্যক্তির পক্ষে সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই আমাদেরকে নির্ভর করতে হয়। তবে তা করতে গিয়ে সর্বদা চোখ-কান খোলা রাখতে হবে; যেন বিনা শর্তে কাউকে মেনে নেওয়ার মতো শিরকের সমস্যা না ঘটে।

প্রচলিত ইসলামী সংগঠন ও আন্দোলনসমূহে নেতৃত্ব ও আনুগত্যের ভারসাম্যের ওপর জোর দেয়া হয়। অথচ ভারসাম্য হওয়া বা না হওয়ার প্রসঙ্গ আসে এমন

বিষয়ের মধ্যে, যাদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রাসঙ্গিক (occasional)। Q এবং U-এর মতো যেসব বিষয়ের মধ্যকার সম্পর্ক অপরিহার্য (necessary), সেসব বিষয়ে ভারসাম্য থাকা না থাকার প্রসঙ্গ বা দাবি একটি অপ্রয়োজনীয় দ্বিরুক্তি (redundancy)।

তাই নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সাথে ভারসাম্যের বিষয় হলো যথোচিত পরামর্শ। আনুগত্যের ওপর মাত্রাতিরিক্ত ও একপেশে গুরুত্বারোপের ফলে পরামর্শের বিষয়টি অকার্যকর (over-shadowed) হয়ে পড়ে। যার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভারসাম্য বজায় থাকে না। এ জন্য নেতৃত্বের দুদিকে দুটি ব্যাপার সমানভাবে থাকতে হবে – নিরবচ্ছিন্ন পরামর্শ এবং আনুগত্য।

কোরআন শরীফে বলা হয়েছে,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“তোমরা ভালো ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে পরস্পরের সহযোগিতা করো না।” [সূরা মায়েদা : ২]

রাসূলুল্লাহর (সা.) একটি হাদীসে বলা হয়েছে,

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“হযরত তারিক বিন শিহাব (রা.) থেকে বর্ণিত, ঘোড়ার রেকাবে পা রেখে এক লোক রাসূলকে (সা.) প্রশ্ন করলো, সর্বোত্তম জিহাদ কোনটি? তিনি বললেন, অত্যাচারী শাসকের মুখের উপর হক কথা বলা।” [সুনানে নাসায়ী]

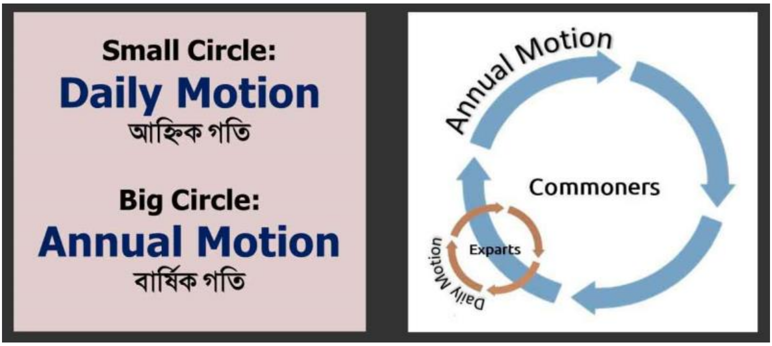

বিশেষায়িত ও সাধারণ পরামর্শ প্রক্রিয়ার উদাহরণ দেয়া যায় এভাবে– পৃথিবী নিজের কক্ষপথে ঘুরে, পাশাপাশি সূর্যের কক্ষপথেও ঘুরে। একইভাবে বিশেষজ্ঞগণ নিজেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

এর পাশাপাশি তারা সাধারণ মানুষের জবাবদিহিতার মধ্যে নিজেদেরকে সোপর্দ করবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যদি পরামর্শ, নেতৃত্ব এবং আনুগত্যের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা যায়; তাহলেই কোনো দল, সংগঠন, সামাজিক আন্দোলন বা রাষ্ট্রের পক্ষে সর্বদা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষকে সঠিক পথে রাখার জন্য আদর্শগত তাত্ত্বিক বিষয়গুলোর বাঁধন ছাড়া অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ না থাকলে বা তেমনভাবে কার্যকর না থাকলে, হতে পারে, ‘উলিল আমর’ তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ একটু একটু করে এক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে আদর্শচ্যুতির শিকার হবেন।

এ ধরনের আদর্শিক বিচ্যুতির সাধারণ (common) বহিঃপ্রকাশ হলো স্বৈরতান্ত্রিকতা। অতএব, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষই তিনটি কর্তৃপক্ষের অধীন:

(১) সংশ্লিষ্ট আদর্শিক নির্দেশ ও নির্দেশনা,
(২) ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ
(৩) অধস্তন জনগণ।

৮. একবিংশ শতাব্দীতে কাজের উপযোগী সংগঠনব্যবস্থা

গুচ্ছ পদ্ধতির সাংগঠনিক কাঠামো

প্রচলিত সাংগঠনিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু সামাজিক আন্দোলনের প্রস্তাবিত সংগঠন কাঠামো হচ্ছে বিকেন্দ্রীভূত এবং গুচ্ছাকার। এ ধরনের সাংগঠনিক কাঠামোর সহজ একটা উদাহরণ হলো মৌচাক। মৌচাকের কোনো কেন্দ্র নাই। এর প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ একটা আরেকটার সাথে সম্পর্কিত। ফলে মৌচাকটি ক্রমান্বয়ে বড় হতে পারে।

অথবা ধরা যাক, বিভিন্ন রং ও আকারের অনেকগুলো বেলুন একসাথে রাখা হয়েছে। বেলুনগুলোর প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র হলেও সুতার একটি গিঁটের মাধ্যমে পরস্পর সংযুক্ত।

পরস্পর সংযুক্ত কিন্তু স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ গুচ্ছের মৌচাকের মতো সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি সেক্টরে নানামুখী সামাজিক সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

এইসব স্বতন্ত্র ব্যক্তি বা গ্রুপগুলোর সৃজনশীলতা ও দায়বোধের সর্বোচ্চ মাত্রার বিকাশকে বিবেচনা করলে সামাজিক আন্দোলনে ব্যক্তি-উদ্যোগের (individual's entrepreneurship) দিকটাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। ইসলামসহ যে কোনো আদর্শনির্ভর সামাজিক আন্দোলনের জন্য এটি সমভাবে প্রযোজ্য।

উল্লেখ্য, সামাজিক আন্দোলনের এই বিকেন্দ্রীভূত সাংগঠনিক কাঠামো প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রশাসনিক দিক থেকে কোনো সংগঠন, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের 'কমান্ড-লাইন' অবশ্যই এককেন্দ্রিক হতে হবে। আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। আর আনুগত্য করো তোমাদের মধ্যকার দায়িত্বশীলদেরকে।" [সূরা নিসা: ৫৯]

এখানে দায়িত্বশীল বলতে কোনো জনপদের সরকারী কর্মকর্তাকে বুঝানো হয়েছে। কোনো ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্বসহ যে কোনো সংস্থা ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দের হুকুম, ন্যায় লঙ্ঘন না হওয়া পর্যন্ত মান্য করা ওয়াজিব।

গুচ্ছ পদ্ধতির সাংগঠনিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

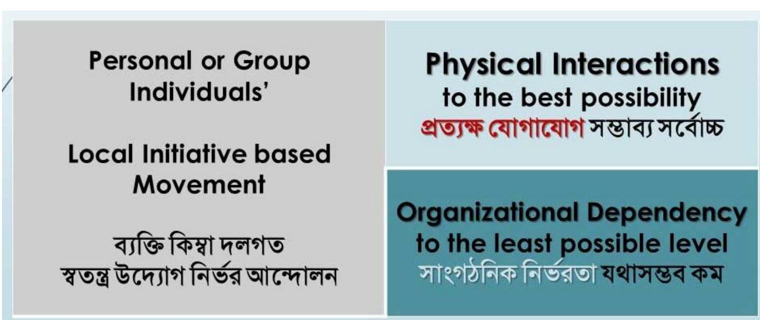

ব্যক্তি বা কোনো গ্রুপ নিজ নিজ আওতাধীন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে সামাজিক আন্দোলন করবে। প্রত্যেকটা স্বতন্ত্র সংগঠনের মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাংগঠনিক নির্ভরশীলতা যথাসম্ভব কম হওয়া উচিত।

প্রচলিত সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের অনেকটাই বিপরীত নতুন ধারার এই আন্দোলনে

মানুষের আত্মপ্রীতির সহজাত বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। মানুষের এই সহজাত আত্মপ্রীতির ইতিবাচক বহিঃপ্রকাশ হলো সৃজনশীলতা। আল্লামা ইকবালের ‘খুদীতত্ত্বে’ আল্লাহর খলিফা হিসেবে ব্যক্তি-মানুষের এই অপরিমিত সম্ভাবনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

গুচ্ছ পদ্ধতির সাংগঠনিক কাঠামোতে আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থা

এ ধরনের সাংগঠিক কাঠামোতে শক্তির সুসামঞ্জস্যতা না হয়ে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে, এ ধরনের আশংকা কেউ করতে পারেন। কিম্বা সাংগঠনিক ঐক্যবদ্ধতার বাধ্যবাধকতা ছাড়া বিকেন্দ্রীভূত সংগঠনগুলো কিভাবে সামাজিক শক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে, এমন প্রশ্নেরও উদ্ভব হতে পারে।

এর জবাব হলো, সংশ্লিষ্ট মৌলিক আদর্শগত বিষয়াদি এসব স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সংগঠনগুলোর পারস্পরিক যোগাযোগের ভিত্তি হবে। কারণ একই লক্ষ্যে পরিচালিত ব্যবস্থাগুলো সমধর্মী হতে বাধ্য। এর উদাহরণ হচ্ছে, নির্দিষ্ট একটি গন্তব্যে পৌঁছার উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী যখন একই রাস্তায় অগ্রসর হয়, সবাই একই যানবাহনে না চড়া সত্ত্বেও তারা কিন্তু একই দিকে পরিচালিত হয়।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” [আলে ইমরান: ১০৩]

ব্যক্তি বা স্বতন্ত্র গ্রুপকেন্দ্রিক উদ্যোগের ফলে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। এর ফলে তাদের মধ্যে যোগ্যতা ও নেতৃত্ব গড়ে উঠবে এবং একজন

আরেকজনকে ছাড়িয়ে যাবে। কোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

"সেই পথে তীব্র গতিতে ছুটে চলো যে পথ চলে গিয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সমান বিস্তৃত জান্নাতের দিকে এবং যা তৈরি করা হয়েছে খোদাভীরু লোকদের জন্য।" [আলে ইমরান: ১৩৩]

অথচ সাংগঠনিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে তীব্র গতিতে ছুটে চলা সম্ভব নয়। এক দড়িতে বাঁধলে ঘোড়াগুলো ছুটতে পারবে না। এমনকি কোনো ঘোড়ার গাড়িতে একাধিক ঘোড়া ব্যবহার করলে সেগুলোও পরস্পরের সাথে বাঁধা থাকে না।

এক ছাঁচে সবাইকে চালানোর চেষ্টা, বিশেষ করে, সামাজিক আন্দোলনের জন্য কখনো ভালো পদ্ধতি নয়। সওদাগরী জাহাজই কেবলমাত্র নির্দিষ্ট রুট অনুসারে চলে, যুদ্ধ জাহাজ নয়।

সাংগঠনিক বাধ্যবাধকতার পরিবর্তে এই স্বতন্ত্র উদ্যোগগুলোর আদর্শিক বাধ্যবাধকতাই যখন মূখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে তখন সেগুলো নিষ্ক্রিয় ও সর্বাত্মকবাদী সংগঠনমুখীনতার পরিবর্তে আদর্শমুখী হিসাবে গড়ে ওঠবে।

সংগঠন হচ্ছে এক ধরনের formal structure। এ ধরনের কাঠামোতে যখন কাউকে এক ধরনের মানের (standard) অধিকারী হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়, তখন বাস্তবে তাঁর ন্যূনতম মানের সর্বদা উপরে থাকার কথা। অথচ দেখা যায়, অধিকাংশ সনদপত্রধারী 'শিক্ষিত' আচার-আচরণ ও জ্ঞানগত মান প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত পর্যায়ে নাই।

দেখা যায়, অনেক 'আল্লামা'র সাথে জ্ঞানের কোনো দৃশ্যমান সংযোগ নাই। আদর্শের দোহাই দিয়ে তৎপরিবর্তে 'আদর্শবাদী সংগঠন'ই প্রাধান্য পেলে জ্যামিতিক হারে 'ক্যাডার বৃদ্ধি'ই ঘটে, বাঞ্ছিত সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবর্তন ঘটে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদাবান, যিনি তাকওয়াসম্পন্ন।" [হুজুরাত: ১৩]

বলাবাহুল্য, নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে রিপোর্টভিত্তিক মানোন্নয়ন কখনো তাকওয়ার মাপকাঠি হতে পারে না। সর্বাবস্থায় ধৈর্যের শরয়ী সীমা যুদ্ধের ময়দান পর্যন্ত বিস্তৃত। ইসলামে ধৈর্যের এই অভিনব ব্যাপ্তির মতো তাকওয়ার সংজ্ঞাও অত্যন্ত ব্যাপক ও ব্যক্তির সামগ্রিক কর্মনির্ভর।

প্রচলিত ইসলামী সংগঠনসমূহের কর্মনীতি এক অর্থে সুন্নতে রাসূলুল্লাহর (সা.) সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কেননা, কোনো ব্যক্তির 'মান' নির্ধারণ করার জন্য তার জীবনসঙ্গী, চলার পথের সাথী, প্রতিবেশী ও অধীনস্তদের মতামত ও মনোভাবকে শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে।

আর ইসলাম-পছন্দ সামাজিক আন্দোলন ও সংগঠনসূহের মধ্যে সময়ে সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে ঐক্য গড়ে ওঠবে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ইস্যুটা যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন তারা আবার যার যার অবস্থানে ফিরে যাবে। একই আদর্শের অনুসারীদের কোনো কোনো দল এগিয়ে যাবে, অন্যরা তাদের ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা করবে।

মানুষ একই মুখ বার বার বা দীর্ঘ সময় ধরে দেখতে চায় না। মানুষের অন্তর্গত এই বৈচিত্র্যপ্রিয়তা ও কর্তৃপক্ষবিরোধী (anti-establishment) মনোভাবের কারণে সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে 'ক্ষমতায় যাওয়া'র বর্তমান প্রবণতা স্পষ্টতই ভুল।

সারকথা হলো, সংগঠন ও আদর্শ যেন শেষ পর্যন্ত একাত্ম না হয়ে যায়, সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

ইসলামী আন্দোলনের ওয়াইড গার্ডেন মডেল

সর্বশেষ, প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোবিন্যাস-কাঠামোকে দুটি দৃশ্যমান উদাহরণের (visual model) মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়। ধরা যাক, দুটি ছবির প্রথমটিতে দেখা যাচ্ছে একটা বড় গাছ (single giant tree), যার অনেক শাখা-প্রশাখা আছে, কিন্তু আশপাশে আর কোনো গাছ নাই। সে একাই বেড়ে উঠেছে। ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয় সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনসমূহ উপর্যুক্ত giant tree model-এ পরিচালিত।

এর সুবিধা হচ্ছে, চারদিকে সমানতালে সংগঠনের অনেক শাখা গড়ে ওঠে এবং কেন্দ্র থেকে এককভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আর অসুবিধা হচ্ছে, এ রকম একটা এককেন্দ্রিক সংগঠন-বৃক্ষের শিকড়ে, গোঁড়ায় বা প্রধান কা- কোনো সমস্যা হলে তা ডাল-লতা-পাতাসহ পুরো বৃক্ষটিতে ছড়িয়ে পড়ে।

এর পরিবর্তে এমন একটি ছবি কল্পনা করা যায়, যাতে রয়েছে নানা আকৃতির, বর্ণের ও অবস্থানের একটি বিস্তৃত বাগান (wide garden)। দেখা যাবে, এই বাগানের ছোট-বড় প্রত্যেক গাছই একই মাটি-আলো-বাতাস থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে যার যার মতো বেড়ে উঠছে ও ফল দিচ্ছে। এখানে প্রত্যেকেই স্বাধীন হওয়ায় একটি গাছ ভেঙ্গে পড়লেও বাগান নষ্ট হয়ে যায় না। বরং নতুন নতুন আরো গাছ বেড়ে ওঠে।

এই ওয়াইড গার্ডেন মডেলকে ভিত্তি ধরে যদি সামাজিক সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলা হয় তাহলে সেটা টেকসই হবে। এই ধরনের প্র্যাকিটিকেল এপ্রোচ তথা বাস্তবসম্মত কর্মকৌশলের ফলে মানুষের সহজাত প্রকাশধর্মী প্রতিভা ও বৈচিত্র্যপ্রিয়তাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যাবে।

সময়ের আবর্তনে যখন একটা আদর্শিক দলের চাহিদা ফুরিয়ে যাবে, তখন সমআদর্শের দলগুলো থেকে যোগ্যতর একটা দল সেই স্থান পূরণ করে নেবে। এতে দল বা সংগঠনের পরিবর্তন হলেও আদর্শ সমুন্নত থাকবে। সব ডিম একই ঝুড়িতে রাখার সমূহ বিপদ থেকে বাঁচা যাবে।

আদর্শ এবং আদর্শের রূপায়ন হিসেবে যে সংগঠন, তাকে যদি আলাদা করা যায় এবং সংগঠন কাঠামো যদি প্লুরালিস্টিক ও ডাইভারসিফাইড করা যায়, তাহলে অবশ্যই একুশ শতকে একটি টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠা, সফল হওয়া ও টিকে থাকা সম্ভব। আদর্শিক চেতনা ভিন্ন সকল সামাজিক বিষয়কেই নমনীয় ও পরিবর্তনযোগ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

৯. সেক্টরভিত্তিক কাজের সাথে ইসলামের সামগ্রিকতার সমন্বয়

কেউ ইসলামের একটা অংশ মানবে, অপর অংশ মানবে না— এটি ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলাম একটি সর্বাত্মকবাদী জীবনাদর্শ ও জীবনব্যবস্থা।

আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"হে মুমিন সকল! ইসলামে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

[সূরা বাকারা: ২০৮]

মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সবদিকেই প্রত্যেকে যার যার জায়গা থেকে এনগেইজ হওয়ার প্রচলিত ট্রেন্ডকে আমাদের প্রস্তাবিত সামাজিক আন্দোলনের মডেলে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এর বিপরীতে আমরা মনে করি, এককেজন এককে সেক্টরে কাজ করবে পূর্ণোদ্যমে, যার যেখানে যোগ্যতা। এটাই হলো কাজে বরকত পাওয়ার একমাত্র উপায়।

যে ধরনের কাজে ব্যক্তি উৎসাহবোধ করে না, তাকে সে ধরনের কাজে এনগেইজ হতে বাধ্য করা হলো টাইম ও রিসোর্সের অপচয়। এটি আল্লাহ প্রদত্ত আমানতের খেয়ানত, এক হিসেবে।

অন্তর্গত প্রতিভা অনুসারে কাজ করা হলো মানুষের ক্রিয়েটিভিটি বিকাশের উপায়। পেশাগত কর্মক্ষেত্র বেছে নেয়ার জন্য এটি সত্যি। সামাজিক অবদান

রাখার কর্মক্ষেত্র বেছে নেয়ার জন্যও এটি সত্যি।

বর্তমান সময়ে সোশ্যাল ওয়ার্ক হিসেবে কাজের প্রধান ক্ষেত্রসমূহ হতে পারে—

(১) বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা
(২) সামাজিক সহায়তামূলক কর্মকাণ্ড
(৩) সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা
(৪) ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ তথা আলেম হিসেবে কাজ করা
(৬) ধর্ম ও নৈতিকতার দাওয়াতদানকারী কোনো সংগঠনের সাথে কাজ করা
(৫) রাজনীতি করা কিম্বা
(৬) গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে কাজ করা।

আমাদের মতে, এই সেক্টরগুলোর কোনো একটার কোনো উদ্যোগের সাথে কেউ সংযুক্ত হবেন। কিংবা এর কোনো একটাতে কিছু একটা করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। হতে পারে, একই ব্যক্তি একাধিক উদ্যোগের সাথে সংযুক্ত আছেন বা থাকবেন। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উচিত কোনো একটা উদ্যোগকে নিজের আইডেন্টিটি তথা মূল কর্মক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করা।

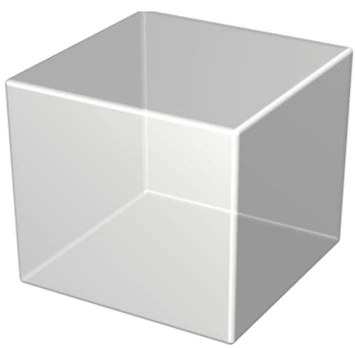

কোনো একটা সেক্টরের কাজের সাথে জড়িত থাকা সত্ত্বেও একজন সচেতন মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের উচিত অপরাপর সেক্টরসমূহে যারা কাজ করছে তাদের প্রতি, অন্তত তাদের কারো কারো কাজের ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা। প্রয়োজনে তাদেরকে সহায়তা করা।

একটা উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বিষয়টা বুঝে নিতে পারি।

যারা রাজনীতি করবেন না, তারা কোনো রাজনৈতিক সংকটের সময় সমমনা লোকদেরকে রাজনৈতিকভাবে সহায়তা করবেন। যেমন, নির্বাচনের সময়ে উপযুক্ত ও সমমনা প্রার্থীদেরকে ভোট দিবেন। অপরদিকে, যারা রাজনীতি করবেন, তারা সেটাতেই পূর্ণ মনোনিবেশ করবেন। কথার কথা, বুদ্ধিজীবীদেরকে তারা সম্মান করবেন। তারা কী বলতে চায়, তা শুনবেন। সম্ভাব্য কোনো সহায়তা ও সমর্থন দেয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে, তা করবেন।

একইসাথে সবকিছু হয়ে উঠার যে চেষ্টা আমরা দেখতে পাই তা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে সব বিষয়ে সমযোগ্যতা দান করেননি। তাই, একইসাথে সব সেক্টরে কাজ করার যে প্রচলিত ভুল পদ্ধতি, তা পরিহার করতে হবে। কেউ যখন কোনো একটা সেক্টরকে তার কাজের বেসিস হিসেবে নিয়ে কাজ করবেন তখন অপরাপর দিকসমূহের কাজের ব্যাপারে তিনি সাধারণভাবে সচেতন, সাপোর্টিভ এবং অকেশনালি কো-অপারেটিভ থাকবেন; এতটুকুই যথেষ্ট। সামগ্রিকতা থাকবে চেতনায়, একাগ্রতা থাকবে বাস্তবিক কোনো একটা দিকে।

কেউ যত 'যোগ্য' বা সিনিয়র হোন না কেন, তিনি নিজের নির্দিষ্ট সেক্টরের বাইরে ভিন্ন ফ্লেভারের কাজে নেতৃত্ব দিবেন না। অন্য ফিল্ডের কাজ অনুমোদন দেয়া না দেয়ার ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন না। কেন্দ্রীয় অনুমোদন ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে সামাজিক আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত (delimit) করে। এটি অনিবার্য।

কোনো একদিকে ফোকাস করে সমমনাদের সাথে যথাসম্ভব স্বাধীন উদ্যোগ নিয়ে কাজ করার এই ধরনটি পুরোপুরি ইসলামসম্মত।

যারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'য় কোনো ওজরের কারণে অংশ গ্রহণ করতে পারে না, তারা জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের সমান সওয়াব অর্জন করেন। যারা দান-সদকা করতে পারেন না আর্থিক সংকটের কারণে, তারা বিশুদ্ধ নিয়তের কারণে সদকাকারীদের সমান সওয়াব লাভ করে থাকেন।

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং চাপিয়ে দেয়া দায়িত্ব পালন মানুষের কর্মোদ্যোগের (entrepreneurship) স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট করে। তবুও কাজের ক্ষেত্রে কিছু না

কিছু স্ট্রাকচার, হাইয়ারর্কি এবং একাউন্টেবিলিটি থাকতে হয়। সামাজিক আন্দোলনের কাজের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক কাঠামো, ক্রমসোপান এবং জবাবদিহিতা হতে হবে ময়দানের দাবি অনুসারে যতটুকু না করলেই নয় ততটুকু। মিনিমাম।

সামাজিক কাজের প্যাটার্নের সাথে সামরিক ও প্রশাসনিক কাজের পার্থক্য বুঝতে পারলে যে কেউ সামাজিক আন্দোলনের এই ধারাকে সহজেই বুঝতে পারবেন, আশা করি।

১০. সামাজিক আন্দোলনের কাজ কি নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ?

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জেনে থাকো।"

(সূরা নাহল: ৪৩)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

"বল- যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান? বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।" (সূরা যুমার: ০৯)

বলা হয়ে থাকে, জ্ঞানচর্চা বা ইলম হাসিল করা হলো সর্বোত্তম আমল। কেননা, যে কোনো উত্তম কাজের পূর্বশর্ত হলো কাজটা যে উত্তম তা জানা। একইসাথে উত্তম কাজটি করার সঠিক পদ্ধতি বা উপায় সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা।

মানুষের জ্ঞানগত বিভ্রান্তি তার কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এটি অনিবার্য।

এর পাশাপাশি আমাদের এটিও মনে রাখতে হবে, নিছক জানার মাধ্যমে কোনোকিছু বাস্তবে সম্পন্ন হয়ে উঠে না। বাস্তবে কাজটি করতে হয়। সঠিক কাজটা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা সত্বেও আমরা অনেক সময়ে সঠিক কাজটি করতে পারি না। এর কারণ দু'টি জিনিসের অভাব বা ত্রুটি:

(১) আখলাক ও

(২) অনুকূল সামাজিক সংস্কৃতি।

আখলাক বা চরিত্র:

একটু আগেই বলা হলো, মানুষের মন-মানসিকতা একটা বড় ব্যাপার। মানুষ নিছক রিজন দিয়ে পরিচালিত হয় না। তার হুইম বা ইনটেনশান একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর, যা তাকে কর্মে নিয়োজিত করে।

মানুষ যদি সত্য-প্রবণ না হয়ে মন্দ-প্রবণ হয় তাহলে তার কাছ হতে সত্যের অনুসরণ আশা করা বৃথা। যুক্তির সত্যের চেয়েও মানুষ অন্তরের সত্য বা আবেগকে প্রাধান্য দেয়।

তাই মানুষের আখলাকের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো না গেলে সত্যিকারের মানবিক উন্নয়ন অসম্ভব ব্যাপার। মানুষের আবেগকে বিবেকের অধীন ও সত্যের অনুকূল করতে না পারলে নিছক বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার মাধ্যমে আমরা মানুষের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করতে পারবো না।

চারিত্রিক উন্নয়ন সাধনের এই কাজটি অনেক বেশি প্র্যাকটিকেল এবং ট্রাবলসাম জব। কাজের ক্ষেত্র নির্ণয়ে বিশেষায়ণের যে কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে তা যদি আমরা বিবেচনায় রাখি তাহলে আমরা বুঝতে পারি, সামাজিক আন্দোলনের যে ধারা বুদ্ধিবৃত্তিক সেক্টরে কাজ করবে তারা চারিত্রিক সংশোধনের কাজে পূর্ণমাত্রায় এনগেইজ হবে না।

এখানে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের সাথে আখলাক এবং সংস্কৃতির গুরুত্বের কথা বলার কারণ হলো এ'দুটিকে বাদ দিয়ে মানুষের সত্যিকারের কল্যাণ হতে পারে না।

তাই বুদ্ধিবৃত্তিক সামাজিক আন্দোলন বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার পাশাপাশি আখলাকের দিকেও যথাসম্ভব লক্ষ রাখবে। যেমন করে আখলাকের ওপর গুরুত্ব দিয়ে যারা সোশ্যাল ওয়ার্ক করবেন তারা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপারে ওপেন এবং যথাসম্ভব একটিভ থাকবেন।

অনুকূল সামাজিক সংস্কৃতি:

কোনো জনপদে বসবাসকারী লোকজন বিভিন্ন বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নে আচরণ করে। একই ভৌগলিক সীমারেখার ভিতরে তারা শুধুমাত্র একসাথে বসবাস করে আর একই ভাষায় কথা বলে, ব্যাপারটা ঠিক এতটুকু মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তাদের মানসিক গঠন তথা চিন্তা-চেতনা, নিজেদের ও অপর হিসেবে (মানে, রিরোধীপক্ষ হিসেবে) যাদেরকে তারা বিবেচনা করে তাদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, বাচনভঙ্গি, শব্দের ব্যবহার তথা রেটরিক, পোশাক-

পরিচ্ছদের স্টাইল, জীবনদর্শন, ধর্ম সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, কৃষ্টি (রিচুয়াল অর্থে), ব্যবসা-বাণিজ্য, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং কার্যপদ্ধতি, খাদ্যাভ্যাস, আনন্দ, বিনোদন ও উৎসব, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক গল্প (মিথ) এবং ঐতিহ্য; এক কথায় তাদের সব কিছু মোটাদাগে একই রকমের হয়ে থাকে।

কোনো সমাজে বসবাসকারী লোকজনের মধ্যকার এই যে সাযুজ্য, এক কথায় একে বলা সামাজিক সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি হলো মানুষের শুদ্ধ পরিচয়। অন্যের মধ্যে মানুষ নিজেকে দেখতে পছন্দ করে। তাই প্রত্যেক স্বীয় অন্তরে লালন করে নায়ক আর ভিলেনের প্রতিচ্ছবি।

মানুষ নতুন কিছুতে অস্বস্তি ও অসুবিধা বোধ করে। মানুষ একইসাথে সৃজনশীল এবং অনুকরণপ্রিয়। স্বভাবতই পরিবর্তনবিরোধী ও সন্দিগ্ধ মানসিকতার। যেমনভাবে আশপাশের সবাই চলছে তেমনভাবে চলতেই মানুষ নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

নিদ্রার পুরো সময়টাতে মানুষ যেমন করে গভীরভাবে ঘুমায় না, জাগ্রতকালীন পুরো সময়টাতে মানুষ যেমন করে পূর্ণ সচেতন থাকে না, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও মানুষ সব সময়ে তার যুক্তিবুদ্ধিকে পুরোপুরি কাজে লাগায় না।

বরং প্রচলিত সামাজিক সংস্কৃতিকে মেনে চলে। বিবেকবিরোধী ও অযৌক্তিক হলেও সেটাকে চ্যালেঞ্জ না করে মানুষ ডমিনেন্ট সংস্কৃতির সাথে মানিয়ে চলে।

এর পাশাপাশি এটিও সত্য, সব মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমান হয় না। বরং খুব কম মানুষই উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি ও আখলাকের অধিকারী হয়ে থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি একটা নিয়মিত চর্চার ব্যাপার। আখলাক বা চারিত্রিক উন্নতিও তাই। ঐকান্তিকতা ও নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা ছাড়া বুদ্ধিবৃত্তিক ও চারিত্রিক উন্নয়ন অসম্ভব।

আগে ব্যক্তির উন্নয়ন, এরপর ব্যক্তি-উন্নয়নের পথ ধরে সামাজিক উন্নয়ন— সামাজিক উন্নয়নের এই কৌশল ভুল। সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির উন্নয়ন হলে অটোমেটিকেলি সামাজিক উন্নয়ন হয়ে যাবে— এটি অবাস্তব ও অকার্যকর এবং অতিসরলীকৃত ধারণা।

আবার, সামাজিক ও সামষ্টিক উন্নয়ন হলে অটোমেটিকেলি ব্যক্তির উন্নয়ন হয়ে যাবে, এটিও ভুল চিন্তা।

উন্নয়ন একটি সামগ্রিক ব্যাপার। একইসাথে ব্যক্তির ও সমষ্টির উন্নয়নের জন্য কাজ করে যেতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক মানের দিক থেকে যে যেখানে আছে সেখান হতে তার উন্নয়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

এ কারণে সামাজিক আন্দোলন ও অনুকূল সামাজিক সাংস্কৃতিক বলয় গড়ে তোলা জরুরি। ওজোন স্তর যেমন করে আমাদেরকে মহাজাগতিক রশ্মির ক্ষতি থেকে রক্ষা করে, সামাজিক সংস্কৃতিও তেমন করে আমাদেরকে সুরক্ষা দেয়। মানুষের শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থার মতো ডমিনেন্ট সোশ্যাল কালচার মানুষকে বাতিল চিন্তা থেকে রক্ষা করে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

সোশ্যাল মুভমেন্টের যেই সেক্টরেই আপনি কর্মতৎপর হোন না কেন, অনুকূল সাংস্কৃতিক বলয় তৈরি এবং এর সুরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আপনাকে সচেতন হতে হবে।

কালচার নিয়ে যারা কাজ করবেন, তারা সেটাতেই ফোকাস করবেন। ইতোমধ্যে এ নিয়ে বেশ কিছু কথা বলা হয়ে গেছে। যারা কালচার নিয়ে কাজ করবেন না, তারা এর উন্নয়নে যথাসম্ভব ভূমিকা রাখবেন। যখন যেখানে যে ধরনের কো-অপারেশনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে সম্ভব হলে তা করবেন।

এভাবে নিজের বিশেষ সেক্টরে ফোকাসড থেকেও আমরা নিজেদের মেটা-থিওরির সাথে কানেকটেড থাকতে পারি। পরস্পরের স্বতন্ত্র কাজগুলোর মধ্যে আমরা সিনার্জি ঘটাতে পারি।

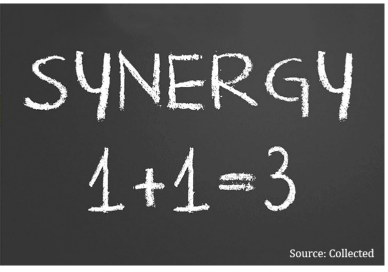

শেষ কথা

ইসলামের দিক থেকে সামাজিক আন্দোলনকে একটা তাত্ত্বিক ভিত্তি দেয়ার জন্য এই লেখা। লেখাটা সংক্ষিপ্ত হলেও সহজে অনুধাবনযোগ্য হবে বলে আশা রাখি।

এরিস্টটলের বরাতে একটা কথা বলা হয়, আমি এটি প্রায়শই বলে থাকি— ‘what we have to learn to do, we learn by doing’। গণমুখী হওয়া ছাড়া গণবুদ্ধিজীবী হওয়া যায় না। কারো বুদ্ধিজীবিতা দ্বারা গণমানুষ উপকৃত না হলে, সমাজ আলোকিত না হলে, নিজের নৈতিক মানগত উন্নয়ন না হলে, সেই বুদ্ধিজীবিতা আশীর্বাদের পরিবর্তে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে।

তাই, কথা নয় কাজে বিশ্বাস করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সঠিক কথাটা সঠিক সময়ে বলতে পারাটা সবচেয়ে জরুরি কাজ। বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সামাজিক গণপরিসর বা পাবলিক-স্ফিয়ারে সঠিক ধারণাগুলো প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা প্রাধান্য পাওয়া।

বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজকর্মী হিসেবে আমাদের প্রত্যেককে বিশ্বাস করতে হবে এই নীতিতে— no intellectuality without activism।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لِمَ تَقُوۡلُوۡنَ مَا لَا تَفۡعَلُوۡنَ

كَبُرَ مَقۡتًا عِنۡدَ اللّٰهِ اَنۡ تَقُوۡلُوۡا مَا لَا تَفۡعَلُوۡنَ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيۡنَ يُقَاتِلُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمۡ بُنۡيَانٌ مَّرۡصُوۡصٌ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা করো না তা তোমরা কেন বলো? তোমরা যা করো না তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে খুবই অসন্তোষজনক। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।” [সূরা সফ: ২-৪]